THE SWADHIKAR

স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

বুলেটিন নং: ৩৯, বর্ষ: ১২, সংখ্যা: ৩, প্রকাশ কাল: ৩০ জুন ২০০৬, শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা $ 5, ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট www.updfcht.org, Email: updfcht@yahoo.com

জেলা প্রশাসকের বিপজ্জনক নজির

সম্পাদকীয় মন্তব্য

অতিসম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীরের নির্দেশনায় বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে "খাগড়াছড়ি ২০০১ -২০০৫" নামে ইংরেজীতে একটি 'তথ্য সংকলন' বের হয়েছে। সংকলনটি জেলা প্রশাসক একটি সংযুক্ত চিঠির মারফত ক্ষমতাসীন সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়েছেন বলে পত্রিকান্তরে জানা গেছে। উক্ত তথ্য সংকলন ও চিঠিতে পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলো সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য থাকায় সঙ্গত কারণে প্রকাশের পর পরই তা নিয়ে বির্তক শুরু হয়েছে। জনগণের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি এবং প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়ে আসছে। প্রথম আলো এক সম্পাদকীয়তে লিখেছে: একজন জেলা প্রশাসক যে অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি যদি সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন, সেটা বিপজ্জনক। (১৫ জুন ২০০৬)।

বিপজ্জনক বলেই আমরা এ সম্পর্কে লিখতে বাধ্য হয়েছি। তথ্য সংকলনটি যদি জেলা প্রশাসন থেকে গ্রন্থিত বা প্রকাশিত না হয়ে কোন সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক লেখা হতো, তাহলে তা ধর্তব্যের মধ্যে নেবার প্রয়োজনই হতো না। কিন্তু জেলা প্রশাসক হচ্ছেন মাঠ পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি। জেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর জেলা প্রশাসক সরাসরি মন্ত্রীপরিষদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন। সেকারণে ভ্রান্তি ও ত্রুটিপূর্ণ হলেও এ তথ্য সংকলনটি সরকারের মনোভাবের প্রতিফলন বলে ধরে নেয়া যায়। না হলে এ ধরনের নিম্নমানের এক তথ্য সংকলনের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে ওয়াস্টপেপার বাস্কেট! নিকৃষ্ট বাজে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখার পেছনে সময় ব্যয়ের বিলাসিতা দেখানোর মানসিকতা আমাদের নেই। পাহাড়ি জাতিগুলো সম্পর্কে ইদানিং অনেক ভুইফোড় গবেষক-পন্ডিত-লেখক হরেক রকম চটি বই ও পুঁথি লিখে চলেছেন, বিশেষত পার্বত্য চুক্তির পর বলতে গেলে রাতারাতি একশ্রেণীর অলেখক লেখক বনে গেছেন! বিশেষ মৌসুমে (পাহাড়ি জনগণের দুর্দিনে) এ নব্য গবেষক-লেখক ও সাংবাদিকদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তাদের সেসব প্রকাশনা উন্নত রুচিবোধসম্পন্ন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা তো দূরের কথা, ফুটপাতের ধূলোবালির সাথে লুটোপুটি খায়।

দৃশ্যত সংকলনটি বিদেশীদের আকৃষ্ট করতে লেখা হয়েছে, না হলে ইংরেজীতে তা প্রকাশের কি কারণ থাকতে পারে? যেহেতু এ সংকলনের উদ্দেশ্য বিদেশী পাঠক, কাজেই এক্ষেত্রে প্রশাসনের দিক থেকে আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিলো। একজন পদস্থ এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসকের অন্তত তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে সৎ থাকা অপরিহার্য ছিলো। কারণ বিদেশী গবেষক ও দাতা প্রতিনিধিগণ কেবল জেলা প্রশাসক বা সরকারের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নন, তারা নির্ভরযোগ্য অনেক উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। সংকলনে গুরুতর তথ্যগত ত্রুটি তো রয়েছেই, অধিকন্তু ভাষাগত দুর্বলতাও স্পষ্ট। সরকারী তথ্য সংকলনে যা কখনই বাঞ্চনীয় নয়।

সংকলনে পাহাড়ি জাতিসত্তা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে সে ব্যাপারে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। সরকারী এ সংকলনে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হলো এই: পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো বাইরে থেকে এসেছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে এত সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরও তারা সরকারগুলোকে নিন্দা করে, বাঙালীদের ঘৃণা করে এবং বাঙালীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

সঙ্গত কারণে ধরে নেয়া যায় যে, জেলা প্রশাসন থেকে সংকলিত বলে এ বক্তব্য জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীর সাহেবের, তথা ক্ষমতাসীন সরকারের। সব জেলা প্রশাসক যে গাঁও-গ্রামের গন্ধ ঝেড়ে ফেলে ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

কল্পনা চাকমার অপহরণের ১০ বছর

তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে পদযাত্রা

কল্পনা চাকমা

কল্পনা চাকমার অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও অপরাধীদের শাস্তিসহ পাঁচ দফা দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন গত ১২ জুন চট্টগ্রামস্থ ষোলশহর রেল স্টেশন থেকে ২৪ পদাতিক ডিভিশন সদর দপ্তর অভিমুখে পদযাত্রার আয়োজন করেছে। সকাল ১১টায় এই পদযাত্রা শুরু হয়। তিন পার্বত্যাঞ্চলসহ চট্টগ্রামের কয়েকশত হিল উইমেন্স ফেডারেশন কর্মি ও সমর্থক প্যাকার্ড-ফেস্টুন বহন করে এই পদযাত্রায় অংশ নেন।

কিন্তু পুলিশ পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদেরকে ২নং গেটের মোড়ে বাধা দেয়। অতঃপর সেখানে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এইচ.ডবিউ.এফ সভাপতি সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিটের সংগঠক অনিমেষ চাকমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট ভুলন লাল ভৌমিক, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক আলী হায়দার, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সভাপতি দীপংকর চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ভবতোষ চাকমা, জাতীয় ছাত্র দল নেতা শেখ ফরিদ রাজু ও বাংলাদেশ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক কাজী সুমী প্রমুখ।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে ন্যায় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কল্পনা চাকমার অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ করা দরকার। অপহরণের ১০ বছর পরও কল্পনা চাকমার হদিস দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের কড়া সমালোচনা করে ২য় পাতায় দেখুন

২৪ পদাতিক ডিভিশন অভিমুখে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পদযাত্রা। ফটো- স্বাধিকার

বর্মাছড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষু লাঞ্ছিত

ভিক্ষু অগ্রবংশ

উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন বর্মাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু লাঞ্ছিত হয়েছেন।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল রাত সাড়ে আটটার দিকে শুকনাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর কামরুলের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনা দল বেনুবন বৌদ্ধ বিহার ঘেরাও করে। সেনা কমান্ডার জুতা পায়ে ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিহারের ভিতরে ঢুকতে চাইলে ভিক্ষু অগ্রবংশ বাধা দেন। এতে মেজর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ভিক্ষুর সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন ও তার কাজে বাধা দিলে পরিণাম শুভ হবে না বলে হুমকি দেন। ভিক্ষু মেজর সাহেবকে বোঝাতে চান যে, বৌদ্ধ ধর্মীয় নীতি অনুসারে জুতা পায়ে বা আগ্নেয়াস্ত্রসহ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। তিনি তাকে অস্ত্র রেখে এসে খালি পায়ে মন্দিরে ঢুকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উক্ত কমান্ডার এতে আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ও তিনি ধর্ম ব্যাপারে লেকচার শুনতে ২য় পাতায় দেখুন

সাভার ও ঢাকায় শ্রমিক বিদ্রোহ: শ্রম সেনাদের বিপবের মহড়া

লেনিন শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বলেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্মি বা শ্রম সৈনিক। অপরদিকে এঙ্গেলস ধর্মঘটকে অভিহিত করেন শ্রমিকদের সামরিক স্কুল হিসেবে যেখানে আগামীদিনের অনিবার্য মহাসংগ্রামের জন্য তারা নিজেদের প্রস্তুত করে গড়ে তোলেন। গত ২০ থেকে ২৪ মে সাভার ও ঢাকায় কয়েক শত গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে হাজার হাজার শ্রমিকের অংশগ্রহণে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং হয়ে গেলো।

সাভারের কাছে আশুলিয়ায় ইউনিভার্স নিটিং ফ্যাক্টরির ৪ হাজার শ্রমিক ১১ দফা দাবিতে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছিলেন। তাদের এসব দাবির মধ্যে রয়েছে মজুরী বৃদ্ধি, ওভারটাইম বিল প্রদান, দৈনিক ৮ ঘন্টা কর্মদিবস, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ইত্যাদি। পত্রিকার রিপোর্টে জানা যায়, ১৫ মে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৩ দিন সময় নিয়ে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেয়। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মালিকপক্ষ ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখে। শ্রমিকরা ২০ মে ফ্যাক্টরির সামনে সমবেত হলে তারা কারখানা বন্ধ দেখতে পায়। শ্রমিকরা সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে এবং অচিরেই তাদের দাবি মানা না হলে কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা দেয়।

এরপর ২২ মে শ্রমিকরা কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে আপোষরফা করার জন্য উদ্যোগ নিলে মালিকপক্ষের ভাড়া করা মাস্তান বাহিনী ও নিরাপত্তা কর্মিরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। প্রতিবাদে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের সমর্থনে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরাও তাদের সাথে সামিল হয়। হাজার হাজার শ্রমিক রাস্তায় নেমে পড়ে, ব্যারিকেড দেয়। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মিরা তাদের ওপর গুলি চালালে পরিস্থিতি ভয়াবহ শ্রমিক বিদ্রোহের রূপ নেয়। ঢাকায় গার্মেন্টস কারখানায়ও এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ৪ দিন ধরে চলা বিক্ষোভে ৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত হন ১৫০ ও শ্রমিক নেতাসহ গ্রেফতার হন শতাধিক। শ্রমিকরা মোট ১৪ ফ্যাক্টরীতে ২য় পাতায় দেখুন

সাভার ও ঢাকায় শ্রমিক বিদ্রোহ

১ম পাতার পর

আগুন ধরিয়ে দেয়, গাজীপুরের এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে ৩০টিসহ মোট ৭০টি ফ্যাক্টরির ক্ষতি সাধন করে।

মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণের উদ্যোগ না নিয়ে শ্রমিকদের বিক্ষোভকে "বাইরের ষড়যন্ত্র", "প্রতিবেশী দেশের উস্কানি" বলে আখ্যায়িত করে যাতে বিক্ষোভ দমনের জন্য অজুহাত খাড়া করা যায়। সরকারও মালিকপক্ষের সাথে সুর মিলিয়ে একই অভিযোগ খাড়া করে। মালিকপক্ষ ও সরকারের আচরণ বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহকে আরো বেশী উসকে দেয়।

'৮০ দশকের গোড়া থেকে বাংলাদেশে পোষাক শিল্পের যাত্রা শুরু। বর্তমানে ৪ হাজার গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ২০ লক্ষ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে এই শিল্পে নিয়োজিত, এর ৮০ ভাগই হলেন নারী। রপ্তানী আয়ের ৭৫ শতাংশই আসে এই পোষাক শিল্প থেকে।

অবর্ণনীয় শোষণ:

বিক্ষোভের পর দু'একটি পত্রিকা শ্রমিকদের চরম দুরাবস্থা ও নির্মম শোষণের চিত্র তুলে ধরে। শ্রমিকদের এক নাগারে দৈনিক ১৪ - ১৫ ঘন্টা খাটতে হয়। তবুও মজুরী ও ওভারটাইম সময় মত দেয়া হয় না। তার ওপর চলে নির্যাতন, যৌন হয়রানি। যে কোন সময় চাকুরী যাওয়ার ভয় তো রয়েছেই। ফ্যাক্টরিতে নেই সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ। আগুন লাগলে কিংবা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে শত শত শ্রমিক এ সব দুর্ঘটনায় মারা যান। ১৯৯০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৪০০ গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্যাক্টরিতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।

শ্রমিকদের ওপর অমানবিক শোষণের চিত্র তুলে ধরে ব্রাসেলস ভিত্তিক International Textile, Garment and Leather Worker Federation জানায় বাংলাদেশের শ্রমিকরা প্রতি ঘন্টায় মজুরী হিসেবে পায় মাত্র ৬ সেন্ট। এ হার ভারত ও পাকিস্তানে ২০ সেন্ট, চীনে ৩০ সেন্ট, শ্রীলংকায় ৪০ সেন্ট ও থায়ল্যান্ডে ৭৮ সেন্ট।

২০০৫ সালের শুরুতে Multi-Fibre Agreement বা কোটা ব্যবস্থা উঠে গেলে উন্নত দেশে গার্মেন্টস রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বাংলাদেশের জন্য চীন প্রধান প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশী উৎপাদকরা তাদের বাজার কেবল ধরে রাখেনি, ২০ শতাংশ বৃদ্ধিও করেছে। কিন্তু এটা করেছে কিভাবে? এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে শ্রমিকদেরকে বেশী খাটিয়ে ও কম মজুরী দিয়ে।

কারা লাভবান হয়?

নুরুল কবীর লেখেন, পোষাক শিল্পে প্রধানত ৪টি পক্ষ জড়িত - সরকার, ফ্যাক্টরির মালিক, পশ্চিমী ক্রেতা এবং শ্রমিক। এদের মধ্যে প্রথম তিন পক্ষই শ্রম শোষণ থেকে অর্জিত মুনাফার ভাগ পেয়ে থাকে। অপরদিকে, শ্রমিকরা অমানুষিক পরিশ্রম করে দু'বেলা খেতে পায় না। তারা ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত। ট্রেড ইউনিয়ন করার মৌলিক অধিকার তাদের নেই। তারা যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হন তা দাসেরই জীবন।

সরকার প্রতি বছর এই সেক্টর থেকে ৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। পশ্চিমা ক্রেতারা কম দামে উৎপাদিত গার্মেন্টস পণ্য কিনে নিয়ে তাদের দেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। অপরদিকে, দেশের গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের সৃষ্টি করা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে বিলাসবহুল জীবন কাটায়, তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া করায় ও তারা পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পর্যটন এলাকাগুলোতে ছুটি কাটায়।

ক্ষয়ক্ষতির দায় কে নেবে?

গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ (বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন) দাবি করেছে শ্রমিকদের সহিংস হামলায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতির দায় নিতে হবে তাদেরকেই যারা বছরের পর বছর শ্রমিকদের ওপর শোষণ নির্যাতন চালিয়ে আসছে, যারা শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ঠ্যাঙারে বাহিনী দিয়ে বর্বর হামলা চালায় এবং সর্বোপরি এ দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে যারা কেবল শক্তি প্রয়োগের ভাষা বোঝে।

শ্রমিক শ্রমিক ভাই ভাই

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিলাসহ বিভিন্ন জায়গায় গার্মেন্টস কারখানা ও ইপিজেড ফ্যাক্টরিগুলো সারাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণীকে টেনে এনেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দিঘীনালা, রাঙ্গামাটির মারিশ্যা, নান্যাচর, জুরাছড়ি ও বান্দরবানসহ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার পাহাড়ি শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করছেন। কেবল মাত্র সাভারে তাদের সংখ্যা ৩ হাজার জন। এ সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তারাও সমানভাবে শোষণ-নির্যাতনের শিকার। এ বছর ফেব্রুয়ারীতে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে অবস্থিত কেটিএস গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি পুড়ে গেলে একজন পাহাড়ি শ্রমিক মারা যান ও অপর একজন গুরুতর আহত হন। সুতরাং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা (ইত্যাদি) শ্রমিকদের স্বার্থ ও বাঙালি শ্রমিকদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন, যদিও পাহাড়ি শ্রমিকরা বাড়তি জাতিগত নিপীড়নের শিকার। কাজেই এই অভিন্ন স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে সেটাই স্বাভাবিক।

দরকার সঠিক নেতৃত্ব

১৮৮৬ সালের যে মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কর্ম দিবসের দাবিতে বিক্ষোভ করেছিল, সাভার ও ঢাকার শ্রমিকরা ১২০ বছর পর একই দাবিতে একই মাসে আন্দোলনে নেমেছেন। শ্রমিকদের এই উত্থান নতুন নয়। গত বছর ১৯ অক্টোবর ঢাকার অদূরে কাঁচপুরে সিনহা টেক্সটাইল মিলেই প্রথম শ্রমিক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। কিন্তু সে বিদ্রোহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত ও রাজনৈতিক উপাদানরহিত। তার তুলনায় ঢাকা ও সাভারের মে মাসের বিদ্রোহ সুনির্দিষ্ট দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত এবং এর ব্যাপকতা ও প্রভাবও অনেক বেশী। কারখানার শ্রমিকদের যদি আর্মির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে যুদ্ধে জয় লাভের জন্য যেমন যোগ্য কমান্ডার ও সঠিক পরিকল্পনা দরকার, শ্রমিকদের দাবি আদায়ের মহাসংগ্রামে বিজয় অর্জনের জন্যও দরকার সঠিক নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব আন্দোলনের ঝড়ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করে তার গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম। শ্রমিকদের আন্দোলন এ ধরনের নেতৃত্ব গড়ে তুলবে। তাই লেনিনের ভাষায় শান্তিকালীন তত্ত্ববাগীশ নেতাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। মে'র বিদ্রোহ থেমে যায় নি। এ বিদ্রোহ ভবিষ্যতের দুর্বার শ্রমিক আন্দোলনেরই পদধ্বনি। তার প্রমাণ ১ - ২ জুন ঢাকার প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় আবারো ৭০ হাজার শ্রমিকের রাস্তায় বিক্ষোভ ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষ।

কল্পনা চাকমার অপহরণের ১০ বছর

১ম পাতার পর

তিনি বলেন, সরকার কিংবা সেনাবাহিনীর যদি দুর্বলতা না থাকতো তাহলে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করার কোন মানে হতে পারে না। কল্পনা চাকমা ইস্যুটি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজ ক্ষান্ত ও শান্ত হবে না মন্তব্য করে তিনি অবিলম্বে কল্পনা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সোনালী চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী সমাজের নিরাপত্তার জন্য সেখানে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে সবচেয়ে বড় হুমকি বলে অভিহিত করেন এবং অবিলম্বে সেখানে থেকে সেনা প্রত্যাহার, জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, ভূমি অধিকার ফেরত দান ও গরীব সেটলারদেরকে জাতিসত্তাগুলোর ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে তাদেরকে সমতলে ফিরিয়ে এনে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের দাবি জানান।

এডভোকেট ভুলন লাল ভৌমিক সম্প্রতি মাইসছড়িতে তার সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, পুরো পার্বত্য অঞ্চল এখনো পুরো সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। সেখানে পাহাড়িদের ভূমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, তৎকালীন পূর্ববাংলার জনগণ অত্যাচারী পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছেন এই আশায় যে, তারা একটা নিপীড়ন-মুক্ত শোষণ-মুক্ত বাংলাদেশ পাবেন। কিন্তু অতীত ও বর্তমান সরকারগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন বহাল রেখেছে। এক দেশে দুই শাসন চলতে পারে না।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা আলী হায়দার বলেন, বর্তমান সরকার সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। দেশে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার কায়েম না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অপরাপর অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ওপর নিপীড়ন বন্ধ হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যত যে সামরিক শাসন জারী রয়েছে তার কারণেই সেখানে কল্পনা অপহরণের মতো ঘটনাগুলো ঘটছে। তিনি বলেন, কল্পনা চাকমার অপহরণকারীর বিচার না হওয়ার মাধ্যমে সরকারের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে। তিনি অবিলম্বে কল্পনা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের এথনিক ক্লিনজিং পলিসির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কাজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা নয়। এসবের দোহাই দিয়ে তারা সেখানে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী আধিপত্য কায়েম করছে। তিনি বলেন, কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের শাস্তি হয় না বলেই সেখানে একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। তিনি অবিলম্বে কল্পনা চাকমার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানান।

অপহরণের ১০ বছর পরও সরকার কল্পনা চাকমার কোন হদিস দিতে ও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের এবং বিশেষ করে পাহাড়ি নারী সমাজের মনে দারুণ ক্ষোভ রয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়। কজইছড়ি ক্যাম্পের অধিনায়ক লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীরা ছিলেন এই অপহরণ ঘটনার নায়ক।

কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশ সোচ্চার হলে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী নানা কল্পকাহিনী ও কলাকৌশলের আশ্রয় নেয়। প্রথমে "হৃদয়ঘটিত ব্যাপার" বলে ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হয়, কিন্তু পরে সেনাবাহিনী সেই অবস্থান থেকে দ্রুত সরে গিয়ে কখনো কল্পনা চাকমা "আত্মগোপন করেছেন", "বেইজিং সম্মেলনে যোগদানের চেষ্টা করেছেন" ইত্যাদি গালগল্প দেশবাসীকে শোনায়। এমনকি সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশন ১৮ জুলাই কল্পনা চাকমার সন্ধানদাতাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়ে হেলিকপ্টার থেকে লিফলেট বিতরণ করে। তথাকথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা নামক সেনাসৃষ্ট একটি ভূঁইফোর সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কল্পনা চাকমা ভারতের ত্রিপুরার গণ্ডাছড়ায় রয়েছেন বলে জানায়।

অপরদিকে, প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। কমিটি কয়েক বছর আগে তদন্ত রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে জমা দিলেও (পত্রিকান্তরে জানা গেছে), তা এখনো আলোর মুখ দেখেনি।

কল্পনা চাকমাকে কারা কি উদ্দেশ্যে অপহরণ করেছে এবং তার ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানার অধিকার দেশবাসী তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী অধিকার হরণসহ একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটার অন্যতম প্রধান কারণ হলো কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌসের মতো অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি না হওয়া এবং সর্বোপরি রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের রক্ষা করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত ন্যায় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অবিলম্বে উক্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা দরকার।

বর্মাছড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষু লাঞ্ছিত

১ম পাতার পর

রাজী নন বলে জানিয়ে দেন। এরপর তিনি ভান্তেকে মন্দিরের বাইরে খোলা মাঠে নিয়ে যান ও চরমভাবে অপমানিত করেন। কামরুল ভান্তেকে বলেন যে তিনি মন্দির থেকে মাইকে ভেসে আসা ধর্মীয় প্রার্থনা সঙ্গীতে ঘুমোতে পারেন না, সুতরাং প্রার্থনার সময় সূচি পরিবর্তন করতে হবে। ভান্তে বলেন যে রাতে কোন প্রার্থনা করা হয় না, সকালেই করা হয়। সুতরাং এতে তার ঘুমের অসুবিধা হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

কমান্ডার তার পছন্দমত সময়সূচি চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে ভান্তেকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে প্রশ্ন করেন তিনি বিয়ে করেছেন কিনা। ভান্তে করেননি বলে উত্তর দিলে কামরুল বলেন, "শালা, কেন বিয়ে করনি?"। এই বলে তিনি দ্রুত চলে চলে যান, উত্তরের অপেক্ষা না করে।

ইদানিং সেনা সদস্য কর্তৃক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওপর হয়রানি ও লাঞ্ছনার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। প্রতিবাদ করলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বাংলাদেশের কারাভ্যন্তরের বিভিন্ন সমস্যা

শেষ পাতার পর

তিনি বলেন, কারাগারে দূর্নীতিতে কারারক্ষী, ওয়ার্ড মেট থেকে শুরু করে কারারক্ষক পর্যন্ত সকলে জড়িত রয়েছে। কয়েদী ও হাজতিদের সাথে দেখা করতে ঘুষ দিতে হয়। খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে বরাদ্ধকৃত দৈনিক ৩৪ টাকা খাওয়ানো হয় না এবং যারা টাকা দেবে তাদেরকে আলাদাভাবে রান্না করে খেতে দেয়া হয়। সিটের জন্য আলাদাভাবে টাকা দিতে হয়। গোসলের ক্ষেত্রেও টাকা দিতে পারলে ভালভাবে গোসল করা যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়। সাক্ষাত রুমে অর্থের বিনিময়ে গাঁজা, ফেন্সিডিল, হেরোইনসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য কারাগারে অবাধে ঢুকানোর অনুমতি দেয়া হয়।

নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, বিভিন্ন অজুহাতে বন্দীদেরকে মারধর করা হয় এবং শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বন্দী শিশু কিশোরদের উপর নির্যাতন এক কথায় অবর্ণনীয়। তাদের ওপর চলে অবাধ যৌন নির্যাতন।

সংবাদ সম্মেলনে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবি জানানো হয়:১. পার্বত্য চট্টগ্রামের কারা ব্যবস্থাপনার উপর জরুরী ভিত্তিতে তদন্ত চালানোর লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা, ২. কারাবন্দীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা, ৩. কারাগারে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি পরিহার করা, ৪. অনতিবিলম্বে কারাবন্দী শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন বন্ধ করা ও ৫. কারা বিধান অনুযায়ী বন্দীদের প্রাপ্য জিনিষপত্র সরবরাহ করা।

পিসিপির ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

শেষ পাতার পর

রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করে আজ এতদূর অগ্রসর হয়েছে। সরকার আগের মতোই পাহাড়ি জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত আওয়ামী লীগ ও বর্তমান চার দলীয় জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবি ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেছে। পাহাড়ি জনগণ কেবল অবহেলিত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত নয়; তাদের ওপর চলছে নির্দয় দমন পীড়ন। সেনা সন্ত্রাসে জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। ভূমি বেদখল বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়িরা তাদের জায়গা জমি হারাচ্ছে। বান্দরবানে হাজার হাজার একর জমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। নিরীহ নিরপরাধ লোকজনকে ধরে ধরে সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। জেল জুলুম ও হুলিয়া পাহাড়িদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভা সমাবেশের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। এক কথায় জুলুমবাজ সরকারের অত্যাচারে পার্বত্য জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। অপরদিকে সরকার নামখাওয়াস্তে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে জনগণ তথা বিশ্ববাসী ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বক্তারা এ যাবত সংঘটিত সকল হত্যাকান্ডের শ্বেতপত্র প্রকাশ ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্রজাতিসমূহকে "উপজাতি" আখ্যায়িত করার নির্দেশকে কঠোর সমালোচনা করে নেতৃবৃন্দ বলেন, এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সর্বতোভাবে পদানত করে রাখার সরকারী নীতির অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা পাহাড়ি জাতিসমূহকে যথাযথ সর্মাদা দিয়ে "জাতিসত্তা" শব্দটি ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

মাইসছড়িতে সেটলাররা বৌদ্ধ মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে

হিউম্যান রাইটস মনিটরিং সেল, ইউপিডিএফ

উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ির মাইসছড়িতে বহিরাগত সেটলাররা একটি বৌদ্ধ মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে। মন্দিরের জমি জোরপূর্বক দখল করাই ছিল এই অগ্নি হামলার উদ্দেশ্য।

গত ১৪ জুন সকাল সাড়ে ৭টায় এই ঘটনা ঘটে। এ সময় বন কুটির বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষুদেরকে পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছিল। বুদ্ধমূর্তিটি যেখানে রাখা হয় মন্দিরের সেই অংশটি আগুনে পুড়ে যায়। তবে বাকি ঘরগুলোতে যেখানে ভান্তেরা থাকেন সেগুলো অক্ষত ছিল।

গত ৩ এপ্রিল মাইসছড়ির সাপ্রু কার্বারী পাড়া ও নোয়া পাড়ায় সেটলার হামলার ঠিক ৭১ দিন পর এই হামলা চালানো হয়েছে। ইউপিডিএফ বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে।

হামলার উদ্দেশ্য:

বনকুটির মন্দিরের মোট ৩০০ একর জমি রয়েছে। মূলত: দায়ক দায়িকারাই এই সব জমি দান করেন। এই জমি জবর দখল করার জন্য সেটলাররা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। গত ২০ মে তারা ঐ জমিতে জোর করে তিনটি ঘর নির্মাণ করে। কিন্তু মহালছড়ি টিএনও-র হস্তক্ষেপে সেটলাররা পরদিন বাড়িগুলো ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়। এরপর আবার ২৩ মে সেটলাররা ৩৫টি বাড়ি তৈরি করে। এবারও টিএনও সেগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন এবং আইনগতভাবে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ জারী করেন। সেটলাররা কিছুদিন চুপ থাকার পর, টিএনও-র নির্দেশ অমান্য করে আবার ১০ জুন ১০টি ঘর নির্মাণ করে। সেগুলো এখনো ভেঙে ফেলা হয়নি। এ নিয়ে এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

"বাড়াবাড়ি করলে বৃষ্টির মতো গুলি করা হবে" - জনৈক সেনা অফিসার

স্বাধিকার রিপোর্ট

খাগড়াছড়ির শিবমন্দিরে মাছ বিক্রেতা ন্যায্য দাম চাইলে জনৈক আর্মি অফিসার হুমকি দিয়ে বলেছেন বেশী বাড়াবাড়ি করা হলে বৃষ্টির মতো গুলি করা হবে।

গত ২৮ মে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ভাইবোন ছড়ার দেওয়ান পাড়া আর্মি ক্যাম্পের সুবেদার রহিম ও তার সেনারা শিবমন্দিরস্থ দোকানে যায়। সেখানে নবীন মোহন চাকমার ছেলে বিনিময় চাকমার (৪৫) কাছ থেকে তিনি কিছু মাছ কিনেন। কিন্তু তিনি মাছের বাজার দাম প্রতি কেজি ১৪০ টাকা হলেও তিনি মাত্র তার অর্ধেক ৭০ টাকা দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হন। বিনিময় চাকমা এতে প্রতিবাদ করেন ও সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। এতে সেনা কমান্ডারটি ক্ষিপ্ত হয়ে হুমকি দিয়ে বলেন, "এখানে অনেক চাঁদাবাজি হয়। বেশী বাড়াবাড়ি করো না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে বৃষ্টির মতো গুলি করবো।" এই বলে তিনি নায্য দাম না দিয়ে দ্রুত চলে যান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক সেনা কমান্ডার প্রায় সময় এভাবে জনগণের উপর জোর জুলুম চালায়। লোকজন সাধারণত ভয়ে এর প্রতিবাদ করে না। কারণ প্রতিবাদ করলে অনেক সময় ফল হয় উল্টো। সেজন্য তারা সেনাদের অত্যাচার ও অপমান নীরবে হজম করে থাকে।

বাঘাইহাটে বিধবা ধর্ষিত

মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঘাইহাটে জনৈক সেনা অফিসার কর্তৃক এক জন বিধবা পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তার নাম রূপালী চাকমা, বয়স ৩২। তার স্বামীর নাম মৃত ধন কুমার চাকমা। বাড়ি হাজাছড়া।

ঘটনা ঘটে গত ১০ এপ্রিল। তিনি সরকার প্রদত্ত ভাতা তোলার পর বাঘাইহাট থেকে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। মধ্য পথে জনৈক সুবেদার কোবাদ গাড়ি থামিয়ে তাকে নামিয়ে দুই টিলা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে চার ঘন্টা আটকিয়ে রেখে ধর্ষণের পর ছেড়ে দেয়। রূপালী চাকমাকে পরে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিন্দুকছড়িতে নারী ধর্ষিত

১৪ এপ্রিল উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মহালছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়িতে মোহাম্মদ সালাম নামে জনৈক সেটলার এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তার নাম নজিবালা ত্রিপুরা স্বামীর নাম অমর জয় ত্রিপুরা।

সিন্দুকছড়ি বাজারের সালাম কোন এক উছিলায় ঐদিন সন্ধ্যায় নজিবালা ত্রিপুরাদের বাসায় যায়। সেখানে তাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের একটি সূত্র ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

খাগড়াছড়ির শিবমন্দিরে সেনারা এক অশীতিপর বৃদ্ধকে পিটিয়েছে

স্বাধিকার রিপোর্ট

খাগড়াছড়ির শিবমন্দির সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা দ্রোনাচার্য পাড়ায় ভাতেন্দ্র চাকমা নামে এক বৃদ্ধকে অমানুষিকভাবে মারধর করেছে। ৭ জুন সকাল সাড়ে দশটায় এ ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধের বয়স ৮৫ বছর।

এছাড়া সেনারা সেখানে ইউপিডিএফ সদস্যদের ব্যবহৃত একটি বাড়ির কাপড় চোপড় ও রান্নার সরঞ্জামসহ সবকিছু খালি করে নিয়ে গেছে। নেম পেট না থাকায় উক্ত ঘটনায় নেতৃত্বদানকারী সেনা কমান্ডারটির পরিচয় জানা যায়নি।

লক্ষীছড়ি সীমানা পাড়ার জনগণের উপর সেনা নির্যাতন

লক্ষীছড়ি প্রতিনিধি ॥

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী'০৬ ভোর রাতে লক্ষীছড়ি জোন থেকে এ্যাডজুটেন্ট মো: মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একদল সেনা লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের সীমানা পাড়ায় অপারেশন চালায়। ভোররাতে ঐ পাড়ার বাসিন্দা আশা মোহন চাকামার (৩৮) বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলে সেনা সদস্যদের টের পেয়ে দু'টো শুকর পালিয়ে যায়। অতঃপর সেনা সদস্যরা ব্রাশ ফায়ার করতে করতে আশা মোহনের বাড়িটা ঘিরে ফেলে। তারা আশা মোহনের পরিবারের সকল সদস্যকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ি থেকে বের করে আনে। ইউপিডিএফ'এর সদস্য লক্ষী চাকমা পালিয়ে গেছে অজুহাত দেখিয়ে তারা বাড়ির সকল সদস্যকে মারধর করতে থাকে। সেনাদের মারধর থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা মহিলাও বাদ যায়নি।

এ ঘটনায় যারা সেনাদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা হলেন- ১. আশা মোহন চাকমা (৩৮) পিত- মৃত শিশুরাম চাকমা, ২. মিসেস চিকন মিলাবো চাকমা (৩০) স্বামী - আশা মোহন চাকমা, ৩. সুজন বিলাস চাকমা (২৮) পিতা- মৃত শিশুরাম চাকমা, ৪. সুমিত্রা চাকমা (৬৫) স্বামী- মৃত শিশুরাম চাকমা সর্ব সাং-সীমানা পাড়া, লক্ষীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

শুধু মারধর করেই সেনারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা আশা মোহনের বাড়িতে তলাশি চালায় এবং বাড়ির জিনিষপত্র তছনছ করে দেয়। এ সময় ১০ (দশ) আনা ভরের একটা সোনার চেইন সেনারা চুরি করে নিয়ে যায়। এরপর সেনারা শুক্র চাকমা (২২) পিতা বিন্দু কুমার চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে তলাশি চালায় এবং শুক্রমণি চাকমাকে মারধর করে। একই সময় বাদিরাম চাকমা (৬৫) পিতা-মৃত তিলক্যা চাকমা ও নিল চাকমার বাড়িতেও সেনারা তলাশি চালায় এবং বাড়ির সকল জিনিষপত্র তছনছ করে দেয়। বাদিরামের বাড়িতে বাক্স ভেঙ্গে ৬৫০ টাকা সেনারা চুরি করে নিয়ে যায় এবং নিল চাকমার বাড়িতেও সেনারা তলাশি চালানোর সময় একটি বাক্স ভেঙ্গে দেয়। এ সময় বাদিরাম চাকমা ও নিল চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। সেনাদের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনে তারা ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান।

এছাড়া, সেনারা একই গ্রামের লক্ষীধন চাকমা (২৬) পিতা মোহন্যা চাকমার বাড়িতে তলাশি চালিয়ে বাড়ির হাড়ি-পাতিল ভেঙ্গে দেয় এবং বাড়ির সকল জিনিষপত্র তছনছ করে দেয়। পূজার অর্ঘ্য হিসেবে বাজার থেকে আনা দুইটা ডিম এবং পূজার জন্য তৈরি করা একটা মদের "কানজি" সেনারা খেয়ে সাবাড় করে দেয়। এ সময় সেনারা মিসেস হাওরুই চাকমা (২৩) স্বামী- এরেয়্যাবো চাকমা-এর উদ্দেশ্যে অশীল অঙ্গভঙ্গি করে। সেনাদের এহেন নিপীড়ন-নির্যাতন ফলে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাড়ার সকল পুরুষ সদস্যরা এখন সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

দিঘীনালার বাবুছড়ায় ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার

১৫ এপ্রিল উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বাবুছড়ায় সেনারা ইউপিডিএফ সদস্য টুকু চাকমাকে গ্রেফতার করে। তিনি এ সময় পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট 'চরমপত্র' বিলি করছিলেন। সেনারা তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও পরে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে তাকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে রাখা হয়েছে।

টুকু চাকমার গ্রামের বাড়ি দিঘীনালার নোয়াপাড়ায়।

পেরাছড়ায় সেনা নির্যাতনের শিকার নিরীহ গ্রামবাসী

স্বাধিকার রিপোর্ট

৩ মে খাগড়াছড়ির পেরাছড়ায় ১৯ গ্রামবাসী সেনা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ঐদিন সকালে পানছড়ি জোনের জনৈক মেজর পেরাছড়ার হেডম্যান পাড়াস্থ রাস্তার পাশের দোকানে গিয়ে লোকজনকে নির্বিচারে বেধড়ক মারতে থাকে। কারণ ঘন্টা খানেক আগে পানছড়ি জোনের একটি মাছের চালান আটকিয়ে লুট করা হয়েছে। ঐ ঘটনার পর উক্ত মেজর লোকজনের কাছে "পাগলা মেজর" উপাধি লাভ করেন।

সেনাদের মাছ লুট হওয়া সম্পর্কে একজন গ্রামবাসী জানান, আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানিনা। তিনি মনে করেন এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। "সকালে পানছড়ি-গামী একটি বাস এখানে এসে থামে, বাস থেকে একজন বাঙালি নেমে এসে মাটিতে মাছ নাকি কি রেখে যায়, কেউ খেয়াল করেনি",

৪র্থ পাতায় দেখুন

সেটলার হামলার ভয়ে পানছড়িতে পাহাড়িরা গ্রামছাড়া

স্বাধিকার রিপোর্ট

২৯ এপ্রিল সকাল থেকে পানছড়ি বাজারের আশে পাশের পাহাড়ি গ্রাম জনশুন্য হয়ে পড়ে। উগ্রসাম্প্রদায়িক সেটলারদের সংগঠন তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলন পানছড়ি বাজারে সমাবেশের পর পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালাবে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে পাহাড়িরা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন।

একজন পুরোনবস্তি বাঙালি হামলার পরিকল্পনার কথা পাহাড়িদের জানায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যগতভাবে পাহাড়িদের সাথে পুরোন বস্তি বাঙালিদের সুসম্পর্ক রয়েছে।

পানছড়ি থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারী কর্মকর্তা জানান, টিএন্ডটি ও শান্তিপুর গ্রাম পুরো খালি। সেখানে কোন পাহাড়ি নেই। "এমনকি স্কুলগুলোও বন্ধ রাখা হয়েছে, পানছড়ি পাইলট স্কুল হোস্টেলের ছাত্রদেরকে তাদের রুম খালি করতে বলা হয়েছে এবং পানছড়ি কলেজেও ক্লাশ চলছে না", জানালেন তিনি।

হোস্টেল বন্ধ হওয়ার পর কিছু ছাত্র শান্তিপুরে গেলে সেখানে তারা দেখতে পায় যে সব বাড়িঘর খালি। খাগড়াছড়ি থেকে জানানো হয়েছে সেখানে পালিয়ে আসা বেশ কয়েকটি পরিবার আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিয়েছে।

তবে "সমঅধিকার আন্দোলনকারীরা" সমাবেশ করলেও কোন অঘটন ঘটেনি। উলেখ্য, ১৯৮৬ সালের ১ মে উগ্রবাদী সেটলাররা শান্তিপুর, মির্জাবিল, সূতকর্মা পাড়াসহ পানছড়ির বেশ কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালালে হাজার হাজার লোক ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়ে বাধ্য হয়েছিলেন।

মুনিগ্রামে জনৈক সেনা মেজর কর্তৃক নিরীহ ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার

গত ৫ মে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি জোনে কর্মরত সেনাবাহিনীর জনৈক মেজর কর্তৃক মুনিগ্রামে কৃপা শান্তি চাকমা (৪০) নামে এক নিরীহ নিরপরাধ দোকানদার প্রহৃত হয়েছেন। তার পিতার নাম মৃত লক্ষী কুমার চাকমা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐদিন শুক্রবার সকাল দশটার দিকে পানছড়ির জোনের উক্ত মেজর সাদা পোষাকে মোটর সাইকেলে করে মুনিগ্রাম এলাকায় আসেন। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আর্মির একটি পিক-আপ ভ্যানও তার পিছনে থাকে। গাড়ি থেকে নেমেই সে এলাকায় তার ভাষায় চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের খুঁজতে থাকে। ইতিমধ্যে স্থানীয় দোকানদার কৃপাশান্তি তার দোকানের মালামাল নিয়ে বাজার থেকে ফিরে আসেন এবং দোকানের ভিতরে মালামাল গোছাতে থাকেন। সেনা কমান্ডার দোকানে ঢুকে কৃপাশান্তিকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন ও সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের পরিচয় জানতে চেয়ে তাকে বেতের লাঠি দিয়ে মারতে থাকেন। বেদম প্রহারের পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতে দেখে দোকানের পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলমান একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে (ডুক্কো মেম্বারের সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান বা সাতদিন্যা) আগতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ভয়ে পালাতে থাকে।

উক্ত মেজর সন্ত্রাসীদের পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত দোকান বন্ধ রাখার জন্য কড়া নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি করুণা চাকমা (৩৫) পীং প্রদীপ চাকমা নামে চিত্ত রঞ্জন পাড়ার অপর এক ব্যক্তিকেও মারধর করেন। তার সৈন্যরা সুকেশ চাকমা (২২) নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে ধরে। কিন্তু গ্রামের লোকজনের প্রবল প্রতিবাদের মুখে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

তার অত্যাচারে ইদানিং এলাকার জনগণ চরমভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন আগে সে পেরাছড়ায় ১৯ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে বিনা কারণে মারধর করে। গাছবান ও শিবমন্দিরে লোকজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

শিবমন্দিরে রাতে সেনা তল্লাশি

স্বাধিকার রিপোর্ট

গত ২৯ মে রাতে খাগড়াছড়ির গিরিফুল আর্মি ক্যাম্প থেকে একটি সেনা দল শিবমন্দিরের ৫ নং রাবার বাগানে গোলাধন চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। সেনারা বাড়িতে ব্যাপক তলাশী চালিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এক কপি গঠনতন্ত্র, পিসিপির এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত "আমি বিদ্রোহী" সুভেনির ও চাকমা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা আভাংপাং "উদ্ধার" করে।

তলাশীতে নেতৃত্বদানকারী সেনা অফিসারটি উক্ত প্রকাশনাগুলো কে পড়ে জানতে চাইলে গোলাধন চাকমার ছেলে মনোরঞ্জন চাকমা (২৮) বলেন যে তিনি সেগুলো পড়েন। তখন সেনা অফিসারটি এ ধরনের প্রকাশনা না পড়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, "কেন মিছেমিছি এগুলো পড়া! এগুলো সন্ত্রাসীরাই পড়ে থাকে। এগুলো পড়লে তোমার অসুবিধা হতে পারে।"

তিনি মনোরঞ্জন চাকমা ও তাদের বাসায় থাকা দেব জ্যোতি চাকমা

৪র্থ পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে জেএসএস-এর সশস্ত্র জঙ্গি কর্তৃক তিন ব্যক্তি অপহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট

২২ মে জেএসএস-এর সশস্ত্র জঙ্গিরা খাগড়াছড়ির লেমুছড়ি থেকে তিন ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে। এরা হলেন মহালছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান আর্কিমিডিস চাকমা, ইউপি সদস্য বিপুল চাকমা ও ত্রিপল চাকমা। তারা মহালছড়ির টিএনও অফিসে আইন শৃঙ্খলা মিটিঙে অংশগ্রহণ শেষে খাগড়াছড়ি ফিরছিলেন।

তাদেরকে বহনকারী প্রাইভেট কারটি লেমুছড়ি পৌঁছলে জঙ্গিরা আটকিয়ে তাদেরকে গাড়ি থেকে বের করে চোখ বেঁধে দিয়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। গাড়ির চালককে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

কুদুকছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্য গুলিবিদ্ধ

স্বাধিকার রিপোর্ট

৩১ মে রাত ১০টার দিকে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র জঙ্গিরা রাঙ্গামাটির কুদুকছড়িতে ইউপিডিএফ জেলা অফিস লক্ষ্য করে গুলি চালালে চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা গুরুতর আহত হন। একটি বুলেট তার হাতের কব্জি ভেদ করে চলে যায়।

পরদিন আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার সময় চরণ সিং অফিসের কাগজ পত্র গোছগাছ করে হাত ধোয়ার জন্য বারান্দায় আসা মাত্রই সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে। এ ঘটনায় জঙ্গি সদস্য আলোড়ন, নতুন, বিজয় সহ আরো ৭/৮ জন নেতৃত্ব দেয় বলে জানা গেছে।

নান্যাচরে জঙ্গীদের হাতে দুই ব্যক্তি অপহৃত, পরে মুক্তি

স্বাধিকার রিপোর্ট

গত ২২ মে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র জঙ্গীরা মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটির নান্যাচর থানাধীন গুবানছড়ি গ্রামের কালাবো চাকমাকে (৪০) অপহরণ করে। দুই দিন আটক রাখার পর ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এরপর ২৮ মে জঙ্গীরা লাঙেল পাড়া গ্রামের রমেশ শীল চাকমাকে অপহরণ করে। তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। পরে এলাকার জনগণের প্রতিবাদের মুখে জঙ্গিরা তাকে বিনাশর্তে মুক্তিপণ ছাড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

অপহৃতরা দুজনই সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসী। তারা ইউপিডিএফ-এর সাথেও কোনভাবে সংশিষ্ট নয়। জেএসএস জঙ্গিরা প্রায়শ মুক্তিপণ আদায়ের জন্য ইউপিডিএফ সমর্থকসহ সাধারণ লোকজনকে অপহরণ করে থাকে। গত কয়েক বছরে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছে।

কুদুকছড়িতে গ্রামের কার্বারী গ্রেফতার পরে মুক্তি

স্বাধিকার রিপোর্ট

২১ মে রাঙ্গামাটি জোনের একটি সেনা দল কুদুকছড়ি উপর পাড়া ঘেরাও করে গ্রামের কার্বারী কান্দর সিং চাকমা (৪০) পীং রাত্তো রাম চাকমাকে গ্রেফতার করে। তাকে রাঙ্গামাটি জোনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হয়।

সেনাদের সাথে ছিল মুখোশ পরা কয়েক জন। লোকজনের ধারণা তারা জেএসএস-এর সশস্ত্র জঙ্গি গ্রুপের সদস্য।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান বানচাল করতে জেএসএস জঙ্গিদের হামলা

প্রখর, রাঙ্গামাটি, ৭মার্চ ২০০৬

৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে দেশের তথা বিশ্বের প্রতিটি নারী সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এ দিবসটি তাদের জন্য আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে ১৯৮৮ সালের এ দিনেই হিল উইমেন্স ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি নিতে রাঙ্গামাটি কুদুকছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কর্মিরা একত্রিত হয়। শুধু হিল উইমেন্স ফেডারেশন সংগঠনের নারীরা নন, স্থানীয় এবং দূর দুরান্ত থেকেও অনেক নারী এসেছিলেন ৮মার্চ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য। তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয় কুদুকছড়ি বাজারের পাশে বাদলছড়ি গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে। নেতৃবৃন্দের প্রাক কর্মসূচির মধ্যে ছিল ৫ ও ৬ মার্চ অনুষ্ঠান সফল করার জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টনসহ চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং ৭মার্চ বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে নারীদের সাথে মিটিংসহ সড়ক ও নৌপথে মাইক যোগে অনুষ্ঠানের প্রচারণা চালানো।

যথারীতি তাদের কর্মসূচি চলতে থাকে। অপরদিকে জেএসএস এর জঙ্গিরাও তাদের বীরত্ব দেখানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী নেতৃবৃন্দ কুদুকছড়িতে জড়ো হয়েছেন। এই সুযোগে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারলে বীরত্বের ঝুলিতে আরো নতুন স্কোর যোগ করা যাবে। তাই ৬ মার্চ'০৬ ভোর রাতে (৩.৩০ টা) জঙ্গীরা বাদলছড়ি গ্রামের বাড়িগুলো অস্ত্রের মুখে একের পর এক তলাশি চালায়। তবে ভাগ্য ভালো, সেদিন নারী নেতৃবৃন্দ গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা শেষ করতে না পেরে একেবারে আলোচনাস্থল কুদুকছড়ি ইউপি হল রুমে রাত যাপন করতে বাধ্য হন। ফলে জেএসএস সশস্ত্র জঙ্গিদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কাউকে না পেয়ে জঙ্গিরা শেষমেষ কুদুকছড়ি বাজার লুট করতে আসে। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। ব্যবসায়ীরা তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিদিন নৈশ প্রহরার ব্যবস্থা করে থাকেন। নিরস্ত্র পাহারদাররা জঙ্গিদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা তাদের উপর চড়াও হয় এবং প্রহরারত ফজলুকে মারাত্মক জখম করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পালানোর পথে তারা কুদুকছড়ি আর্মি ক্যাম্প লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিও ছোঁড়ে।

জেএসএস জঙ্গিদের মুখ ছিল গামছা দিয়ে বাঁধা। এতে প্রমাণিত হয় তারা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে কাজ করার সাহস রাখে না। সেনাসৃষ্ট মুখোশবাহিনীর সদস্যরাও মুখোশ পরে মিছিল করতো এবং রাতের আঁধারে মুখোশ পরেই লোকজনের বাড়িতে তারা সন্ত্রাস চালাতো। কিন্তু শেয়াল তার গলায় নকল কেশর লাগালেও লেজটা লুকাবে কোথায়? লোকজন জেএসএস জঙ্গিদের চিনে ফেলেছেন। কুখ্যাত উত্তম চাকমা ও রাহুল চাকমাসহ ৭জন বাছাই করা জঙ্গি এই ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডে অংশ নেয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিতে আসা নারীদের উপর এহেন আক্রমণ প্রচেষ্টার জন্য এলাকার লোকজন জেএসএস এর প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছেন। কেউ কেউ এমনও বলছেন জঙ্গিরা মুখোশ পরে আসার অর্থ হচ্ছে তারা অবশ্যই মহিলাদের ইজ্জত হরণ করতো। কারণ তাদেরতো চরিত্র এবং আদর্শ বলতে কিছুই নেই।

ঘিলাছড়িতে জঙ্গিদের হামলায় ইউপিডিএফ সদস্য খুন

স্বাধিকার রিপোর্ট

ফিদিক্যা চাকমা

সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র জঙ্গিদের সন্ত্রাসী হামলায় মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটির নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়িতে এক ইউপিডিএফ সদস্য খুন ও অপর একজন আহত হয়েছেন। নিহত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম সঞ্চয় বিকাশ চাকমা ওরফে ফিদিক্যা।

৮ জুন এ ঘটনা ঘটে। সেদিন ছিল ঘিলাছড়ি বাজারের হাট বার। ইউপিডিএফ সদস্যরা সকালে বাজারে আসছিলেন। সোয়া দশটার দিকে তারা ঘিলাছড়ি মধ্যপাড়ায় পৌঁছলে ওঁৎ পেতে থাকা জঙ্গিরা তাদের লক্ষ্য করে কাছে থেকে গুলি চালায়। এতে ফিদিক্যা চাকমা নিহত ও নাগর চান চাকমা আহত হন। ঘটনার পর অপর এক ইউপিডিএফ সদস্য উত্তরণ চাকমা নিখোঁজ হন। পরে অবশ্য তার খোঁজ পাওয়া গেছে।

ইউপিডিএফ ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয়। জেএসএস জঙ্গিদের দমনে সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতার সমালোচনা করে বিবৃতিতে বলা হয়, "জেএসএস জঙ্গিরা একের পর এক সশস্ত্র হামলা চালিয়ে দুই শতাধিক ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থককে খুন করলেও সরকার তাদের গ্রেফতারের জন্য আজ পর্যন্ত কিছুই করেনি। বরং সেনাবাহিনীর একটি অংশ অব্যাহতভাবে জঙ্গিদের মদদ দিয়ে চলেছে।"

জেএসএস জঙ্গি জোকোশের ডাকাতির নতুন কৌশল

সত্য প্রিয় চাকমা, বড়াদম, দিঘীনালা

গেল ১৭ মে ডা. জাকোশের নেতৃত্বে ১০ -১২ জনের একটি সশস্ত্র জেএসএস জঙ্গি দল প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা সোয়া সাতটা পর্যন্ত বাবুছড়া বাজরের পশ্চিমে ডিবি পাড়া গ্রামে দিনভর সশস্ত্র মহড়া প্রদর্শন করে। এই জঙ্গি দলে বাঘাইছড়ি দোরের পুরোন বাসিন্দা ভেক্কে চাকমা (বর্তমান ঠিকানা বাল্যাছড়া, বানছড়া) ও ছাদারাছড়া গ্রামের দুলেয়ে চাকমাও ছিল। এ সময় জঙ্গিরা বিনা কারণে তুঙ্যা চাকমাকে আচ্ছা করে রাম ধোলাই দেয়।

কেবল সশস্ত্র মহড়া দেয়া জঙ্গিদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা ৫ নং বাবুছড়া ইউপির ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্য বরুণ কুমার চাকমার মাধ্যমে মৃত্যু হুমকি সম্বলিত একটি চিঠি বাবুছড়া বাজারের দোকানদার শোভা শান্তি চাকমা ওরফে চোক্কোর কাছে পাঠায়। চিঠির খামের ভেতরে দুই রাউন্ড একে ৪৭ রাইফেলের গুলিও ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জঙ্গিরা চিঠিটি হাতে হাতে পৌঁছে দিয়ে উত্তর নিয়ে আসার জন্য বরুণ কুমার চাকমাকে কড়া নির্দেশ দেয়।

এদিকে চিঠিটি খুলে দেখার পর চোক্কো দোকানদারের যেন মাথার ওপর আকাশ থেকে বজ্র ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। হঠাৎ মৃত্যু পরোয়ানাসহ এক মুহূর্তও দেরী না করে ২০ হাজার টাকা চাঁদা প্রদানের চিঠি পেয়ে তিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। তিনি বলেন, তিনি তো কোন দোষ করেন নি। কারো ক্ষতি করেননি। তবুও কেন তার কাছ থেকে এতগুলো টাকা দাবি করা হলো?

পরদিন সকলে চোক্কো দোকানদার বড়াদমে জঙ্গি জাকোশের সাথে দেখা করেন। এরপর কি হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি।

চোক্কো দোকানদারের মতো দিঘীনালা ইউপি চেয়ারম্যান চন্দ্র রঞ্জন চাকমাও অনুরূপ একটি চিঠি পান। জঙ্গিরা তার কাছেও খামের ভিতর ২টি এ-কে ৪৭ রাইফেলের বুলেটসহ ৫ টন গমের ভাগ চেয়ে চিঠি দেয়।

দিঘীনালা এলাকায় সশস্ত্র জঙ্গি কমান্ডার ডা. জাকোশের অবর্ণনীয় অত্যাচারে জনগণ এখন চরমভাবে অতিষ্ঠ। কিছু বখাটে ও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেকে তার সশস্ত্র গ্রুপে ভিড়ে কাজ করছে। তবে লোকজনের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেলে যে কোন সময় এলাকাবাসী এসব জঙ্গি গ্রুপের বিরুদ্ধে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানতে পারেন। এর আগেও জনগণ তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুনিগ্রাম, মাইসছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। শত শত গ্রামবাসী তাদেরকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। অস্ত্র ও গুলির হুমকিও তারা সেদিন পরোয়া করেননি। ঐক্যবদ্ধ জনগণের কাছে সকল অপশক্তি পরাজিত হতে বাধ্য।

গুইমারায় ইউপিডিএফ সদস্য গুলিবিদ্ধ

স্বাধিকার রিপোর্ট

২৪ মে খাগড়াছড়ির গুইমারায় জঙ্গিরা সদ্য কারামুক্ত ইউপিডিএফ সদস্য মানবেন্দ্র চাকমা ও তার স্ত্রী সুমিতা চাকমাকে গুলি করে গুরুতর আহত করেছে। রাত সাড়ে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তখন সে তার এক আত্মীয় সচিরণ চাকমার বাড়িতে গল্পগুজব করছিল।

মানবেন্দ্রর বুকে ও পায়ের গোড়ালিতে গুলি লাগে। অপরদিকে, তার স্ত্রীর পাঁজরে গুলি ভেদ করে চলে যায়।

ভন্ড ভিক্ষুর আদম ব্যবসা!

এক শ্রেণীর ভিক্ষু ইদানিং আদম ব্যবসা শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠছে। শ্রীলংকায় বসবাসরত এক ভিক্ষু সংগঠনের নেতা জানিয়েছেন, শ্রীলংকায় পাঠানোর নাম করে ছাত্রদের অভিভাবকের কাছ থেকে কতিপয় ভন্ড ভিক্ষু মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে থেকে কোমলমতি ছেলেদের শ্রমন করে শ্রীলংকায় নিয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে শ্রীলংকার দূর অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা সটকে পড়ছে। এতে ঐ সব ছেলেদের পড়াশোনাতো হচ্ছেই না, তার ওপর অজানা অচেনা জায়গায় তারা নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ ধরনের ঘৃন্য পেশায় জড়িত কতিপয় ভিক্ষুর নামও জানানো হয়েছে।

ভিক্ষু নেতা জানান, রাঙ্গামাটির রাঙাপানি এলাকার কান্ত দেওয়ান (ভিক্ষু) আজ পর্যন্ত কম পক্ষে ১২০ জনকে টাকার বিনিময়ে শ্রীলংকায় নিয়ে গেছে। এদের মধ্যে একজন ত্রিপুরা ছেলেও রয়েছে। কান্ত দেওয়ান জানুয়ারী মাসে শেষ বর্ষ পরীক্ষার পর ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসে। এ সময় সে ১১ জনকে শ্রীলংকায় নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

কান্ত দেওয়ান ছাড়াও আরো কয়েকজন ভিক্ষু ওশ্রমনের নাম পাওয়া গেছে, যারা এভাবে মানুষ পাচারের সাথে জড়িত। তাদের ভাবমূর্তির স্বার্থে আপাতত নাম প্রকাশ করা হলো না।

উক্ত ভিক্ষু নেতা এভাবে ভন্ড ভিক্ষু ও শ্রমনের মাধ্যমে শ্রীলংকায় ছেলে না পাঠানোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অভিভাবককে পরামর্শ দিয়েছেন।

শিবমন্দিরে রাতে সেনা তলাশী

৩য় পাতার পর

পীং কৃষ্ণ চাকমা ও এরেং চাকমা পীং বীরেন্দ্র চাকমাকে রাতে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাড়ির লোকজন এতে তীব্রভাবে বাধা দেয়। পরে কমান্ডার তাদেরকে পরদিন সকালে গিরিফুল ক্যাম্পে গিয়ে দেখা করতে বলেন।

পরদিন সকালে তারা ক্যাম্পে যায় ও ক্যাম্প কমান্ডারের সাথে দেখা করে।

পেরাছড়ায় সেনা নির্যাতনের

৩য় পাতার পর

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান। তার মতে মাইসছড়ি হামলার বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ সবচেয়ে বেশী প্রতিবাদী ভূমিকা রাখার কারণে তাকে জব্দ করতে ইউপিডিএফ এর ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত পেরাছড়ায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে "মাছের চালান লুট" হওয়ার নাটক মঞ্চস্থ করে।

তিনি আরো জানান উক্ত বাসটি চলে যাওয়ার পর পরই একটি সেনা পিকআপ এসে লোকজনকে পেটাতে থাকে। অথচ তখনো মাছের চালানটি মাটিতে পড়েছিল। তারা সেটা দেখেও না দেখার ভান করে।

সেনারা এছাড়া পেরাছড়ায় বাড়ি বাড়ি তলাশী চালায় ও ইউপিডিএফ সদস্যদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে স্বনির্ভরস্থ পার্টি অফিসে যায়।

এক বিবৃতিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম পেরাছড়ায় নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানান। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন, জন্ম উদ্যম চাকমা পীং মতিলাল চাকমা, ত্রিপল চাকমা পীং দেবপ্রিয় চাকমা, মিঠুন চাকমা পীং নুনু মনি চাকমা, উদ্দীপন চাকমা পীয় উতুমনি চাকমা, কান্তি বিকাশ চাকমা পীং দিবিকা নন্দ চাকমা, বিদ্যাসাগর চাকমা পীং অনুরুদ্ধ চাকমা, ত্রিপন চাকমা পীং কণক বরণ চাকমা, কল্যাণ চাকমা (দোকানদার) পীং হরিরাম চাকমা, রাতুল বাপ পীং সত্যবান চাকমা, মেগ্য চাকমা পীং অজ্ঞাত, নির্মল ত্রিপুরা পীং ইন্দ্র মোহন ত্রিপুরা, সোনালী বাপ পীং ব্রবাহু চাকমা, সূর্য্য বিকাশ চাকমা পীং অজ্ঞাত, সুশান্ত চাকমা পীং প্রশান্ত চাকমা, খুকু চাকমা পীং বীরতুর চাকমা, টুকু চাকমা পীং অজ্ঞাত, সাধন চাকমা পীং পূর্ণ কান্তি চাকমা, জীবন্ত চাকমা (স্কুল ছাত্র) পীং অজ্ঞাত এবং দিগন্ত ত্রিপুরা পীং জগত জ্যোতি ত্রিপুরা।

নান্যাচর হুদুকছড়ি সাংগঠনিক সফরের অভিজ্ঞতা

রিংকু চাকমা

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর মিটিঙের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংগঠনের কার্যক্রম প্রসারিত করার লক্ষ্যে নান্যাচর ও হুদুকছড়ির সাংগঠনিক দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২ সেপ্টেম্বর '০৫ আমি চট্টগ্রাম থেকে সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই। এমন সময় জানতে পারি একই তারিখে পার্টির একটি অডিট টিম নান্যাচরে যাবে। তাই আলোচনা সাপেক্ষে আমরা অডিট টিমসহ রওনা হই। অডিট টিমে ছিলেন অপু চাকমা, মাইকেল চাকমা, সোনালী চাকমা, রিপন চাকমা ও রিকো চাকমা। টিম প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন অপু চাকমা। সন্ধ্যার সময় আমরা পৌছলাম কাউখালীতে। সেখানে আমাদের সাথে আরো যোগ হয় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রিনা দেওয়ান ও নেপালী চাকমা। অবশ্য তারা দীর্ঘদিন ধরে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন কাউখালীতে। আমাদের সাংগঠনিক টিমটিতে আরো দু'জন যুক্ত হলো। তার পরদিন অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর দুপুর বেলায় পায়ে হেঁটে সন্ধ্যায় আমরা পৌছলাম হুদুকছড়িতে। ইউপিডিএফ কার্যালয়ে সে রাতটা কাটাই। সেখানে দেখা গেল পাশ্ববর্তী আর্মি ক্যাম্প থেকে সেই রাতে দু'জন সেনা জোয়ান দুই তিনবার অফিসে এসে উঁকি মেরে যায়। তার পরদিন ৪ সেপ্টেম্বর হুদুকছড়ি বাজারের হাট বার। সেদিন ইউপিডিএফ প্রতিনিধিরা এলাকার শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় বসেন। তারা যখন অফিসে কথা বলছিলেন সে সময় হঠাৎ দু'জন সেনা অফিসার কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি না নিয়ে ইউপিডিএফ অফিস কক্ষে ঢুকে পড়লেন। আসা মাত্রই একজন সেনা অফিসার উপদেশমূলক বক্তব্য শুনাতে লাগলেন (উপদেশ তো নয় খবরদারিমূলক কথাবার্তা)। আর একজন সেনা অফিসার আমাদের সফরকারী দলের সদস্য রিপনের দিকে এগিয়ে এসে নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। রিপনও স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেন। সেই সেনা অফিসারটিও একভাবে মাতব্বরী ফলিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমরা নান্যাচরের দিকে রওনা হলাম।

নান্যাচরে প্রায় দীর্ঘ ৫(পাঁচ) মাস আমি অতিবাহিত করি। এ সময়ে সেখানকার অনেক মুরুব্বী ও যুবকদের সাথে মত বিনিময় হয়। অনেক মুরুব্বী নান্যাচরের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করেন। আসলে বর্তমানে নান্যাচর নামটি আগে ছিল না। যখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু হয় তখন থেকে চাকমাদের দেয়া নামকরণগুলো পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ ইধহমধষরংধঃরড়হ শুরু হয়। এই নান্যাচরে হান্যা নামে একজন চাকমা ছিলেন। এলাকার লোকজন বাজারে আসা-যাওয়া করার সময় হান্যার বাড়িতে বিশ্রাম নিতো। হান্যা ছিলেন একজন কর্মঠ কৃষক এবং তিনি চর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন চাষ করতেন। এজন্য এলাকার লোকেরা হান্যাচর নাম রেখেছিলেন। আর হান্যাচর বললে লোকেরা চিনতে পারতো। ধাপে ধাপে এই হান্যাচর শব্দটি নান্যাচরে রূপ লাভ করে। যখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় তখন থেকে এই নান্যাচর শব্দটি নানিয়ারচর-এ বিকৃত হয়। তারপরও আমি নান্যাচরই লিখলাম। এই এলাকায় আরো অনেক স্থানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

এলাকার লোকজন জানান, বর্তমানে এই নান্যাচরে চলছে সেনাবাহিনী এবং জেএসএস-এর দুই নাম্বারীদের মধ্যে দহরম-মহরম। সেনাবাহিনী ও জেএসএস-এর যোগসাজশে বিভিন্ন অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। নান্যাচর বাজার এখন দুই নাম্বারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সহযোগিতায় তারা করে যাচ্ছে। চেঙ্গী স্কোয়ার ক্লাব নামক জায়গায় তারা রাত-দিন মাতাল অবস্থায় থাকে। এই জায়গাটিকে তারা নামকরণ করেছে জুয়াখেলার আড্ডাখানা। পাশ্ববর্তী এলাকার যুব সমাজও তাদের দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছে। যেখানে একজন সচেতন যুবক তাদের এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কথা, সেখানে তারা প্রতিবাদ না করে ২ নাম্বারীদের সমস্ত ধরনের অপকর্মগুলো রপ্ত করে নিচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, "২ নাম্বারীরা এমন খারাপ কাজ করছে যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। মদ্যপান করে মাতাল অবস্থায় সিদ্ধার্থ চাকমা প্রায় সময় নারীদের বিরক্ত করে। রাত হলে চোরের মত এই ঘর থেকে ঐ ঘরে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়।" তাদের কান্ড কারখানা আর নোংরামি এখানে লেখা হলো না। ঘৃণাভরে তাদের প্রত্যাখান করাটাই হবে যথার্থ।

এই সিদ্ধার্থ চাকমাকে বর্তমানে এলাকার লোকজন সরকারের দালাল হিসেবে চিনে। রাতে সেনাবাহিনীর পোশাক পড়ে সেনা সদস্যদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। গত কিছুদিন আগে এই সিদ্ধার্থ চাকমা সন্ত্রাসী ধরার নামে নান্যাচরের রাঙ্গী পাড়ায় সেনাবাহিনীর সাথে যায়। চারজন লোকের কাছে অস্ত্র আছে এ মিথ্যা তথ্য সে সেনাবাহিনীকে দেয়। ঐ নিরীহ ৪ ব্যক্তির উপর সেনাবাহিনী নির্যাতন চালায়। পরে কোন অস্ত্র না পেয়ে নির্যাতন করার পর ছেড়ে দেয়। পরে নান্যাচর ইউনিটের ইউপিডিএফ প্রতিনিধিরা এ ঘটনার প্রতিবাদ জানালে সেনাবাহিনীর টু-আই-সি ক্ষমা চেয়ে নেন এবং ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেন। নান্যাচর বাজারের স্থানীয় কয়েকজন মুরুব্বীর সাথে আলোচনা করে আরো জানা যায়, গত ১৬ আগষ্ট জেএসএস-এর দুই নাম্বারী যথাক্রমে জ্ঞান চাকমা (নলেন), অমর সিং চাকমা, সিদ্ধার্থ চাকমা (সেনাবাহিনীর দালাল হিসেবে চিহ্নিত), পাপুল চাকমা ও রনেল চাকমা গংরা সেখানকার নান্যাচর নির্বাহী অফিসারের পানি মর্টার চুরি করে। যা শুনলে সকলেই লজ্জা পায়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর রাঙ্গামাটি থেকে তাদের কয়েকজন চেলা-চামুন্ডা এসে টিএনও'র সাথে বোঝাপড়া করে উলেখিত ব্যক্তিদের জামিনে ছাড়িয়ে নেয়।

গত বছর ১৭ নভেম্বর পালন কালেও দুই নাম্বারীরা বাধা দেয়। ১৭ নভেম্বর শোকসভা করার লক্ষ্যে স্থানীয় ইউপিডিএফ প্রতিনিধিরা এক সপ্তাহ আগে থানা নির্বাহী অফিসার, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সেনাবাহিনীর জোন কমান্ডারের নিকট অবগতি পত্র দেন এবং উক্ত অবগতি পত্রটি বুঝিয়া পাইলাম এই মর্মে তারা লিখিতও দেয়। ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যার সময় সেনাবাহিনীর জোন থেকে ফোন করে জানানো হয় যে, যে জায়গায় সমাবেশের স্থান দেয়া হয়েছে সেখানে সমাবেশ করা যাবে না। একইভাবে রাত ৮টার দিকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেলাল হোসেনও ফোনে জানালেন একই কথা। তারপর দিন সকাল ১০টার সময় আবারো সেনাবাহিনীর জোন থেকে ফোনে জানানো হয় যে, একটু প্রয়োজন আছে তাই স্যার ডাকছেন। সমাবেশের সময় তখন মাত্র এক ঘন্টা বাকী। আমরা ইউপিডিএফ প্রতিনিধি বিপুলাক্ষ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কণিকা দেওয়ানসহ চারজন জোনে গেলাম। এ সময় আমাদের অপেক্ষা করছিলেন জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল ফজলুল হক, মেজর জায়েদ, এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন কামরুল, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেলাল হোসেন। তারা জানালেন দুই নাম্বারীরা আপনাদের জায়গায় সমাবেশ করবে সুতরাং আপনারা জায়গা পরিবর্তন করে টিএন্ডটি বাজারে করুন। আমরা অনেক যুক্তি দেখানোর পরও তারা কোন যুক্তি গ্রহণে রাজী হলেন না। শেষ পর্যায়ে আমরা হাইস্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে সমাবেশ করার প্রস্তাব দিলাম। কিন্তু এতেও তারা সম্মতি দিলেন না। তারা নাকি কোন ঝামেলা হোক সেটা চান না। মোট কথা দুই নাম্বারীদের প্রশ্রয় এবং আশ্রয় দেয়াটাই তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য। অবশেষে আমাদের সমাবেশটি তাদের নির্ধারণ করে দেয়া জায়গা অর্থাৎ টিএন্ডটি বাজারের পাশে যাত্রী ছাউনির পাশে করতে হলো। অথচ যে কোন মিছিল-মিটিং সমাবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী সকল গণতান্ত্রিক কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করে থাকে। সেনা শাসনই এখানে চলছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অপকর্মে সেনাবাহিনী লিপ্ত রয়েছে।

সেই প্রতিক্রিয়ায় লোকজন বলতে থাকেন- "তারা (দুই নাম্বারীরা) বানা নিজ' জাদর্ মাধাবো হেই পারিবাক্কে। সমাবেশ গরিবার সেদাম তারার নেই।" অর্থাৎ তারা কেবল নিজ জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে, সমাবেশ করার সাধ্য তাদের নেই।

তিনি বললেন," আপনাদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (ইউপিডিএফ আর জেএসএস) এটা আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীই জিইয়ে রেখেছে। এবং এটা তাদেরকে উপর মহল থেকে নির্দেশ প্রদান করা আছে। আর সে কারণেই দুই নাম্বারীরা যতই খারাপ কাজ করুক না কেন তাদেরকে কিছু করা যাচ্ছে না। তাছাড়া আমাদের তো বর্তমানে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়।"

সমাবেশের সময় দেখা গেল দুই নাম্বারীদের সমাবেশ তো দূরের কথা সেই জায়গায় একটা গরু-ছাগল পর্যন্ত নেই। বরং উলেখিত সিদ্ধার্থ চাকমা (দালাল) গংরা আমাদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে আসা লোকদের উল্টো ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মাঝ পথ থেকে ফেরত পাঠায়। সেই প্রতিক্রিয়ায় লোকজন বলতে থাকেন- "তারা (দুই নাম্বারীরা) বানা নিজ' জাদর্ মাধাবো হেই পারিবাক্কে। সমাবেশ গরিবার সেদাম তারার নেই।" অর্থাৎ তারা কেবল নিজ জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে, সমাবেশ করার সাধ্য তাদের নেই। সন্তু লার্মা চুক্তির পরবর্তী সময়ে এই নান্যাচর গণহত্যাকে বিতর্কিত বলে এক সময় সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। কাজেই তারা কিভাবে সেই গণহত্যার বার্ষিকী পালনের জন্য সমাবেশ করবে? গত ২৯ নভেম্বর রাত ৮টায় সিদ্ধার্থ চাকমা (দালাল) ও অমর সিংহ চাকমা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে সেনা সদস্যদের সঙ্গে নান্যাচরের উত্তর ফিরিঙ্গি পাড়ায় গিয়ে ইউপিডিএফ-এর দুই কর্মিকে আটক করে। তারা হলেন, প্রবল চাকমা ও লক্ষণ চাকমা। তাদেরকে সেখানে নির্মমভাবে নির্যাতন করার পর চোখ বাঁধা অবস্থায় জোনে নিয়ে আসে। সেখানেও রাতভর অমানুষিক শারিরীক নির্যাতন চালানো হয়। অবশ্য তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রবিরোধী কোন কিছু তারা পায়নি। পরদিন নান্যাচর থানার এসআই মনিরকে জোনে ডেকে তার কাছে উক্ত দুই ইউপিডিএফ কর্মিকে সোপর্দ করে এবং শারিরীক নির্যাতনের ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে নান্যাচর স্বাস্থ্য কমপেক্সে নামমাত্র চিকিৎসা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানোর জন্য মনিরকে নির্দেশ দেয়। কিছুদিন পর ১১ ডিসেম্বর তারা জামিনে মুক্তি পায়।

বর্তমানে যে বিষয়টি সবচেয়ে দুঃখজনক সেটি হলো কোন ইউপিডিএফ কর্মির জন্য নান্যাচর সদর বাজারে যাওয়া নিষিদ্ধ। এটা একেবারেই সেনা প্রশাসন থেকে জারি রয়েছে। তাদের যুক্তি হলো, সদরে দুই নাম্বারীরা অবস্থান করছে। কাজেই নান্যাচরে কিছু অঘটন হোক তারা সেটা চায় না। আর দুই নাম্বারীরা যতই খারাপ কাজ করুক তাদেরকে কিছুই করা যাবে না। সেনাবাহিনীর এ ধরনের অপকর্মের হোতাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার নীতির প্রমাণ মেলে ২০০৪ সালের ১৬ নভেম্বরের ঘটনায়। ১৭ নভেম্বর পালনের জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি জায়গা নির্বাচন ও শহীদদের বেদিগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে যান নান্যাচর বাজারে। এ সময় দুই নাম্বারীরা আমাদের প্রতিনিধিবৃন্দের উপর হামলা চালায়। ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা দুই নাম্বারীদের কিছু না করে উল্টো ইউপিডিএফ প্রতিনিধিদের উপর লাঠিপেটা করে। এতে কয়েকজন প্রতিনিধি আহত হয়। বর্তমানেও একইভাবে দুই নাম্বারীরা সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় থেকে বিভিন্ন অপকর্ম করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে নান্যাচর থানার একজন গোয়েন্দা সংস্থার লোকের সাথে আমার কথা হয় (নাম প্রকাশ করছি না)। তিনি বললেন," আপনাদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (ইউপিডিএফ আর জেএসএস) এটা আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীই জিইয়ে রেখেছে। এবং এটা তাদেরকে উপর মহল থেকে নির্দেশ প্রদান করা আছে। আর সে কারণেই দুই নাম্বারীরা যতই খারাপ কাজ করুক না কেন তাদেরকে কিছু করা যাচ্ছে না। তাছাড়া আমাদের তো বর্তমানে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়।" তিনি একেবারেই খোলামনে এ কথাগুলো বললেন।

তারপর দেখা হয় ৬০ বছরের এক বৃদ্ধের সাথে। তার নাম দোয়েল চন্দ্র চাকমা। তার ছেলে বর্তমানে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামে কাজ করছে। এ কারণে তাকে নিজ আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, ঘর-সংসার ছেড়ে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। তাকে দুই নাম্বারীরা চিঠি দিয়ে নির্দেশ জারি করেছে ২০ দিনের মধ্যে তার ছেলেকে যদি তাদের কাছে নিতে না পারলে রাঙ্গামাটি জেলা ত্যাগ করতে। তাই তিনি বর্তমানে খুবই মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। দুই নাম্বারীদের দ্বারা ভিটেবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হওয়া প্রায় ৭০-৮০টি পরিবারের সাথে আমার আলাপ হয়। আলাপচারিতায় জানতে পারি তাদের কারো বাড়ি সুভলং, ত্রিপুরাছড়া আর কারো বাড়ি হাড়িকাবা। দুই নাম্বারীদের ভয়ে তারা নান্যাচরের বিভিন্ন জায়গায় ঠাঁই নিয়ে কোন রকমে দিনাতিপাত করছেন। তাদের মধ্যে কারো আত্মীয়-স্বজন ইউপিডিএফ-এ কাজ করছে। আর কেউ কেউ ইউপিডিএফ-এর কার্যক্রমকে সমর্থন করেন। এই হচ্ছে তাদের দোষ। আলাপকালে তারা জানান, উচ্ছেদ হয়ে আসার সময় বাড়িতে যেসব জিনিষপত্র ছিলো সেগুলোর কিছু অংশ দুই নাম্বারীরা বিক্রি করে দিয়েছে। আর কিছু কিছু জিনিষ তারা নিজেরাই ভোগ করছে। এভাবেই বলতে লাগলেন দুই নাম্বারীদের কর্তৃক উচ্ছেদ হওয়া পরিবারের লোকজন। তারা আবেগ তাড়িত কন্ঠে বললেন, আমরা জানিনা ভবিষ্যতে ইউপিডিএফ ক্ষমতায় এলে যারা এ সমস্ত অপকর্ম করছে তাদেরকে ইউপিডিএফ কোন দৃষ্টিতে দেখবে।

তাই পরিশেষে দুই নাম্বারীদের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো যে, যে সমস্ত নিরীহ জনগণের ওপর অন্যায়ভাবে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার জন্য জনগণের কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। সময়ের জন্য অপেক্ষায় থাকুন। ■

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ৩০ জুন ২০০৬ ■ বুলেটিন নং ৩৯

প্রসঙ্গ নতুন ভোটার তালিকা নবায়নকরণ

নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম. এ. আজিজ-এর জন্য এক বিরাট চপেটাঘাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে নতুন ভোটার তালিকা করা হলো তার ঠাঁই শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট বাস্কেটে। বাংলাদেশের মতো গরীব দেশের জন্য এ এক মস্ত বড় অপচয়, যা ক্ষমার অযোগ্য। গোঁয়ার্তুমি যে নিজের ও দশের কত ক্ষতি করতে পারে সিইসি আজিজ তার উদাহরণ হিসেবে থাকবেন।

কিন্তু তিনি এর মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কারণ তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তার এ অবস্থানের পক্ষে কোন জোরালো যুক্তি নেই। বরং এতে গোঁয়ার্তুমিই প্রকাশ পায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা নবায়ন করা উচিত এবং এটাই নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য কাজ। প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকায় দূর পাহাড়ে যাদের বাস, তারা দীর্ঘ পথ হেঁটে নির্বাচনী অফিসে এসে নিজের নাম রেজিষ্টারভুক্ত করবেন এমন দায়িত্ববোধ আমরা সবার কাছ থেকে এখনো আশা করতে পারি না। আধুনিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাদপদ এ সমস্ত এলাকার লোকজন ভোট দেয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন। মাঠ পর্যায়ে ভোটার তথ্য সংগ্রহকারীরা অনেক সময় ঐ দূর দূরান্ত অঞ্চলে যেতে চান না। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাদের ভোটার করার ব্যাপারে এবার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হোক। দেশের সকল নাগরিক যাতে আগামী নির্বাচনে তাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান করা হোক।

জেলা প্রশাসকের বিপজ্জনক নজীর

১ম পাতার পর

পরিশীলিত মননের অধিকারী হতে পারবেন এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু কোন জাতির জনগণের প্রতি আকণ্ঠ বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে এমন অসংস্কৃত কথাবার্তা বলা একজন জেলা প্রশাসকের পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য একেবারে অশোভন। শুধু তাই নয়, জেলা প্রশাসক হিসেবে তার যোগ্যতা কতটুকু, নাকি পাহাড়ি বিদ্বেষই তার একমাত্র যোগ্যতা সে ব্যাপারেও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক।

জেলা প্রশাসক যেভাবে বেপরোয়া ও উন্মত্ত হয়ে পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিষ ছিটিয়েছেন তা তিনি সরকারের উর্ধ্বতন কারো প্রশ্রয় না পেলে করতে পারেন না। রাষ্ট্রীয় পলিসির অংশ হিসেবেই তা তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে করেছেন সেটাই ধরে নিতে হবে। এও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জেলা প্রশাসক হিসেবে যে কর্মকর্তাকে যে অঞ্চলে উপযুক্ত বলে সরকার মনে করে, তাকেই সেখানে নিযুক্ত করে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, সরকার কোন্ সময়ে কোন্ পলিসি বাস্তবায়ন করতে চাইছে সে অনুসারে সেই কাজ বা পলিসির জন্য তার বাছাইকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে থাকে। এর অন্যথা ভাবাই বোকামি। সুতরাং আপাদমস্তক পাহাড়ি বিদ্বেষী এক কর্মকর্তাকে জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সরকার খাগড়াছড়ি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন পলিসি কার্যকর করতে চায়, সেটা বুঝতে কারোর অসুবিধে হবার কথা নয়। মাইসছড়িতে সেটলার হামলা, একের পর এক জমি বেদখল ইত্যাদির সাথে জেলা প্রশাসকের উক্ত বিষাক্ত মন্তব্যের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

আমেরিকায় এক সময় 'কু ক্লাক্স ক্লান' (Ku Klux Klan সংক্ষেপে KKK) নামক জঘন্য ফ্যাসিবাদী সংগঠন কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধী hate campaign বা বিদ্বেষমূলক প্রচারণার জন্য কুখ্যাত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামেও কিছু উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও ব্যক্তির মধ্যে কু ক্লাক্স ক্লানদের প্রেতাত্মা ভর করেছে বলে সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের বিরুদ্ধে তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলনের যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও খোদ সরকারী পর্যায়ে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা তারই পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সংকলনটিতে বলা হয়েছে যে, পাহাড়িরা সরকারী প্রশাসন ও বাঙালিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে। এখানে দীর্ঘ বক্তব্যের দরকার নেই। জেলা প্রশাসনের উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা প্রয়োজন, যেভাবে বছরের পর বছর সাধারণ পাহাড়ি জনগণ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত ও সর্বোপরি জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নিজ বাসভূমিতে পরবাসী হচ্ছেন তাতে তাদের অনেকের মনে শাসক বাঙালি জাতি সম্পর্কে এক ধরনের ঘৃণাভাব জাগরিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এজন্য অবশ্যই তাদেরকে দোষ দেয়া চলে না। ইহুদী রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে যদি প্যালেস্টাইনীদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষ জন্ম নেয় তার জন্য কি তাদের দোষ দেয়া চলে? 'একের দোষে সকল নষ্ট' কথাটির মতো একশ্রেণীর উগ্র সাম্প্রদায়িক নিপীড়ক বাঙালিদের অপকর্মের কারণে গোটা বাঙালীরাই নিপীড়িত পাহাড়ি জনগণের কাছে অপরাধী হিসেবে গণ্য হচ্ছে। নিপীড়িত জাতির জনগণের মধ্যে কেন জার্মানী নামটি এত ঘৃণিত সে সম্পর্কে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর উক্তি তার জীবনী গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে: "The blame for the infamies committed with the aid of Germany in other countries", Engels wrote, "falls not only on the governments but to a large extent on the German people. But for the delusions of the Germans, their slavish spirit, their flair for acting as mercenaries and 'benign' jailers and tools of the masters 'by devine right', the German name abroad would not be so detested, cursed and despised, and the nations oppressed by Germany would have long since been able to develop freely."

"Germany", he wrote, "will liberate herself to the extent to which she sets free neighbouring nations." (F. Engels, A Biography. Progress Publishers, Moscow.)

অর্থাৎ এঙ্গেলস লিখেছেন, অন্য দেশে জার্মানীর সহায়তায় কুকীর্তি সম্পাদনের দায়ভাগ কেবল জার্মান সরকারের ওপর বর্তায় না, ব্যাপক মাত্রায় তা জার্মান জনগণের ওপরও বর্তায়। জার্মানদের বিভ্রম, তাদের দাসত্বমূলক মনোভাব এবং তাদের ভাড়াটে সৈনিক, 'নম্র' কারারক্ষক ও 'ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে' হওয়া প্রভুদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করার দক্ষতা না থাকলে, জার্মান নামটা বিদেশে এত ঘৃণিত, নিন্দিত ও ধিকৃত হতো না এবং জার্মানী কর্তৃক নিপীড়িত জাতিগুলো বহু কাল আগে থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারতো।

জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীর

তিনি লেখেন, "জার্মানী তার প্রতিবেশী জাতিগুলোকে যে পরিমাণ মুক্তি দেবে সে (জার্মানী) সেই পরিমাণ নিজেকে মুক্ত করবে।"

১৯৭৯ সালে সমতল থেকে সেটলারদের নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে আন্তরিক সদ্ভাব ছিল এবং এখনো পুরোনবস্তি বাঙালিদের (যাদেরকে ইদানিং আদিবাসী বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে) সাথে পাহাড়িদের সম্পর্ক আগের মতোই আছে। অনেক ক্ষেত্রে পুরোনবস্তি বাঙালিরাও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধিকার আন্দোলনে সহযোগিতা করেছেন ও তার জন্য নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। এমনকি তারও আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক দশকব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধ লড়াই চালাচ্ছিলেন তখনও রাঙ্গুনীয়ার সাধারণ বাঙালিরা সেনাপতি রনু খাঁ ও তার পালোয়ানদের (যোদ্ধা) নানাভাবে সহযোগিতা দিয়েছিলেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'সুনীতি ভূষণ কানুনগোর "Chakma Resistance to British Domination" বইটি দেখুন)। কিন্তু যখনই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেটলারদের নিয়ে আসা হল এবং তাদেরকে আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু হল, তখন থেকেই এই চিত্র নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায়। সেটলারদের নিয়ে আসার এক বছর যেতে না যেতেই পাহাড়িদের ওপর প্রথম গণহত্যা সংঘটিত হল রাঙ্গামাটির কাউখালিতে ১৯৮০ সালে। এই গণহত্যায় সেনাবাহিনী ও সেটলাররা যৌথভাবে অংশ নিয়েছিল। এটাও এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ১৯৭২ সালে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যে স্মারকলিপি দেন সেখানেও বাঙালি প্রত্যাহারের কোন দাবি ছিল না, যদিও সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি জনসংখ্যা যথেষ্ট ছিল এবং প্রশাসন যন্ত্রের সবখানেই বলতে গেলে তাদের একাধিপত্য বজায় ছিল। এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের কোনটির উগ্রজাতীয়তাবাদী বাঙালি বিদ্বেষী কর্মসূচী নেই। সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বসানের দাবি একটি যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং এই দাবির জন্য কখনোই পাহাড়িদেরকে বাঙালি বিদ্বেষী আখ্যায়িত করার সুযোগ নেই। সেটলাররাও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। (এ সম্পর্কে দেখুন পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট, Life Is Not Ours)। তাদেরকে বছরের পর বছর সরকারী রেশন দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে গুচ্ছগ্রাম নামক বন্দীশালায় রাখার কোন মানে হয় না। ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করে দেয়ার হাতিয়ার হিসেবে সেটলারদের ব্যবহার না করে সরকারের উচিত তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা। সাধারণ সেটলাররাও অবশ্যই ভালো নেই। তারাও নানাভাবে শোষণ ও প্রতারণার শিকার। তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাও যে এক প্রকার নিপীড়ন তা হতভাগ্য সেটলাররা উপলব্ধি করতে অক্ষম। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদেরকে এভাবে সরকারী রেশনের ওপর নির্ভরশীল করে রাখলে লাভ হয় কেবল গুটিকয় সরকারী আমলা, সেনা কর্মকর্তা ও সেটলার লিডারের। এরাই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি যারা সেটলার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এরা প্রথমত, সেটলারদের জন্য বরাদ্দকৃত রেশনে লুটপাট চালায়। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিমভাবে সেটলারদেরকে গুচ্ছগ্রামে রাখার জন্য দরকার হয় সেনাবাহিনীর। এই সেনাবাহিনীর উপস্থিতির জন্য দরকার বর্ধিত বাজেট, যা সরকারী কোষাগার থেকে ব্যয় হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা উপস্থিতি বজায় রাখার জন্য ঠিক কত খরচ হয় তার কোন তথ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় না। এক হিসাব মতে এই খরচের পরিমাণ বছরে ১২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার, অর্থাৎ ৮৭৫ কোটি টাকা (১ ডলার = ৭০ টাকা)। (Indigenous world 2005, International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen, May 2005).এ টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন স্বচ্ছতা নেই। সেনাদের কোন প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে কত টাকা বরাদ্দ দেখিয়ে কত টাকা লোপাট করা হচ্ছে তা জানার অধিকার (?) কারোর নেই।

কোন জাতির জনগণের ওপর শোষণ নির্যাতন চালানো হলে সেই জাতির আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণের অধিকার রয়েছে। যখন ন্যায় ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ সকল পথ রুদ্ধ বা অকার্যকর হয়ে যায় তখনই জনগণ অস্ত্র ধারণ করেন। ১৯৭১ সালে এদেশের জনগণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তাই করেছিলেন। প্রত্যেক নিপীড়িত জাতিকে এভাবেই নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়েছে। দাবি আদায়ের শান্তিপূর্ণ পথ বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অস্ত্র ধারণে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা এখানে স্পষ্ট করা দরকার যে, পাহাড়ি জনগণ সাধারণ বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা সশস্ত্র সংগ্রামের মতো কঠিন জীবন বেছে নিয়েছিলেন। হুমায়ুন কবীর সাহেবদের মানসিকতার জন্যই পাহাড়ি জনগণ অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছেন। আর উন্নয়নের কল্পকাহিনী পাকিস্তানীরাও এদেশের জনগণকে শুনিয়েছে, যেভাবে তিনি আজ পাহাড়ি জনগণকে শোনাতে চাইছেন। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র জাতির জনগণের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করার তার যে দাবি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই।

বরং এখানে ইতিহাস বিকৃতি সম্পর্কে বলা দরকার। পুস্তিকায় বলা হয়েছে বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করে একটি জেলা সৃষ্টি করে। আসলে তথ্য বিকৃতিরও সীমা থাকা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন সময়ই চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম নামটি বৃটিশদেরই দেয়া। তার আগে পাহাড়ি জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চলকে বলা হতো প্রথমে চাকোমাস ও পরে কার্পাস মহল। এক শ্রেণীর লেখক ও গবেষক পার্বত্য চট্টগ্রামকে মোগল সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে প্রমাণ করতে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন এবং এখনো চালাচ্ছেন। কিন্তু তারা কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বৃটিশ উপনিবেশের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন ছিল এটা এক অবিসংবাদিত সত্য।

দেশে এখন ইতিহাস বিকৃতির মহোৎসব চলছে। যেখানে গত দুই আড়াই দশকের ঘটনার তথ্যপঞ্জি দলিত মথিত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কি আশা করতে পারেন? যাদের কাছে বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু হয় শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে, অথবা জিয়াউর রহমানের শাসনকাল থেকে, তারাই আমাদের শাসক এবং তারাই আমাদের ইতিহাস আমাদের শেখাতে চান। আমাদের এই শাসক ও তাদের কৃপাভাজন "ইতিহাসবেত্তাগণ" ঘৃণাক্ষরেও পাহাড়ি জনগণের বীরত্বপূর্ণ বৃটিশবিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের কথা বলেন না, পাশে এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াতে চায়। কোন জাতির জনগণকে পদানত রাখতে হলে অবশ্যই সেই জাতির ইতিহাসকে বিকৃত ও কুৎসিত করে তুলে ধরতে হবে, তাদের সংস্কৃতি আদিম পশ্চাদপদ বলে অভিহিত করতে হবে, তাদের চলাফেরা ও জীবনাচারকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ করতে হবে। অর্থাৎ নিপীড়িত জাতির জনগণ নিপীড়ক জাতি অপেক্ষা নীচ - এই ধারণা নানাভাবে ও নানা কৌশলে জনগণের মনে বদ্ধমূল করতে হবে। এই শিক্ষা শাসকগোষ্ঠি তাদের বৃটিশ প্রভুদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। তারা শিখেছে কোন জাতিকে পদানত রাখতে হলে কেবল বাহুবলে সম্ভব নয়, শাসিতদের মনোজগতেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে উপজাতি বলার জন্য চিঠি এমনি এমনি দেয়া হয় না। এর পেছনে নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে .. আর তা হলো ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে চিরকালের জন্য অধীনস্থ ও পদানত করে রাখা।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের এ তথ্য সংকলনটি একটি নিকৃষ্ট ও বিপজ্জনক নজির হিসেবে থাকবে, সেই সাথে হুমায়ুন কবীরের নামও। এ সংকলনের মাধ্যমে আমরা প্রশাসনের রূপকেই দেখতে পেয়েছি, যা কুৎসিত ও ঘৃণ্য। খাগড়াছড়িবাসী তথা গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে তিনি একজন উগ্র সাম্প্রদায়িক জাতিবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাধিকার ■ বুলেটিন নং ৩৯ ■ বর্ষ ১২ ■ সংখ্যা ৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র উদ্ধারের নাটক এবং সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন

দেবংশি

প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী-বিডিআর কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের খবর প্রায়ই চোখে পড়ে। কোন ক্যাম্পের কোন কমান্ডার কিভাবে কি ধরনের অস্ত্র কার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে তার বিস্তারিত ফিরিস্তি ছবিসহ এইসব খবরে থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর দেয়া তথ্যকে সম্বল করে লেখা এসব রিপোর্টের সত্যতা কতটুকু? সাধারণ পাঠক যারা সহজে বিশ্বাস করেন তাদের কাছে একের পর এক "অস্ত্র উদ্ধারের" ঘটনায় মনে হতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন অস্ত্র ও গোলাবারুদের খনি রয়েছে। অপরদিকে, যারা জিজ্ঞাসু, যাদের সামান্যতম অনুসন্ধিৎসা রয়েছে এবং যারা পত্রিকার হেডলাইনের বাইরে যেতে চান তাদের মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উদয় হতে পারে যে, অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাগুলো "ক্রসফায়ারে" সন্ত্রাসী নিহত হওয়ার মতো কিনা। যদি এসব ঘটনা "ক্রসফায়ারের" মতো সাজানো হয়ে থাকে তাহলে এর পেছনে গোপন উদ্দেশ্য কি? প্রথমে দু'একটি ঘটনার উলেখ করে দেখা যাক অস্ত্র উদ্ধার জিনিসটা কি।

গত ৭ আগস্ট ২০০৫ দৈনিক সংবাদের একটি খবরের শিরোনাম হচ্ছে "রাঙ্গামাটিতে একে-৪৭, চাইনিজ রাইফেল ও গুলিসহ আটক ২"। খবরে বলা হয়, সেনা সদস্যরা মাচলং এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইউপিডিএফ সদস্য আয়রন চাকমা ও সন্তু চাকমাকে ১টি একে-৪৭, ১টি চাইনিজ রাইফেল ও ৭ রাউন্ড গুলি ও ১টি ৭ পয়েন্ট ৬২ চাইনিজ রাইফেল ও ১৯ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেফতার করে। আরো বলা হয়, আটককৃতদের কাছে রক্ষিত বিপুল সংখ্যক পোশাকাদি ও কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। দৈনিক আমার দেশসহ বিভিন্ন পত্রিকাও এ খবরটি ছাপায়। অথচ এ খবরের কোন সত্যতা নেই। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা সে এলাকারই কিশোর। যাদের বয়স বড় জোর ১৩/১৪ বছরের মধ্যে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদেরকে মাচালং বাজার এলাকা থেকে আটক করা হয়। গ্রেফতারের সময় তাদের কাছ থেকে বন্দুক ও গোলা বারুদ কেন, একটি চাকুও পাওয়া যায়নি। বেআইনী কোন কাগজপত্র পাওয়ার কথাও চরম মিথ্যাচার। এই দুই জন আসলে ইউপিডিএফ-এ ভর্তি হওয়ার জন্য এসেছিল। কিন্তু বয়স কম হওয়ার জন্য তাদেরকে ভর্তি করা হবে কি হবে না সেই সিদ্ধান্ত ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

অপর এক ঘটনা হলো, অতি সম্প্রতি গত ৪মার্চ'০৬ খাগড়াছড়ির বিজিতলা থেকে সেনাবাহিনী বাজার চৌধুরীসহ ছয়জন নিরীহ সাধারণ জনগণকে রাতের আঁধারে ঘুম থেকে তুলে ধরে নিয়ে আসে। পরদিন কয়েক জন সেনা সদস্য কোর্ট কাষ্টোডি থেকে তাদেরকে আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে জোরপূর্বক বাইরে নিয়ে এসে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি ওঠায়। এরপর তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে অস্ত্র আইনে মামলা দেয়া হয়। এসব মিথ্য বানোয়াট খবর দেশের সকল পত্র পত্রিকায় ফলাও করে ছাপানো হয়। এমনকি উক্ত সংবাদটি বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকাও প্রচার করে। সত্যতা যাচাই না করে সেনাবাহিনীর দেয়া তথ্যগুলো হুবহু প্রচার করা কেবল দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক নয়, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

বান্দরবানের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। সেখানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, হাতে নাতে কাউকে গ্রেফতার করার ঘটনা নেই বললেই চলে। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে "বান্দরবানে সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্রের ভান্ডার : ৬মাসের অভিযানে ৩৭টি একে-৪৭সহ বিপুল অস্ত্র উদ্ধার, ৫০টি আস্তানা ধ্বংস" (সংবাদ ৮ আগস্ট ২০০৫)। গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বান্দরবান থেকে র‍্যাব ও বিডিআর কর্তৃক ২০টি একে-৪৭ রাইফেল ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের খবর লিড নিউজ হিসেবে এসেছে।

বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের খবর এসব দেখে মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে যত্রতত্র অস্ত্রের খনি রয়েছে। কিন্তু এ সব অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা দুই একটা বাদে সবই যে সাজানো ব্যাপার তা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দৈনিক সংবাদের একটি শিরোনাম হলো, "পুলিশ-বিডিআরের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য: 'নাইক্ষ্যংছড়িতে অস্ত্র উদ্ধার সাজানো নাটক।' উক্ত শিরোনামের খবরে বলা হয়েছে, নাইক্ষংছড়ির থানার এস আই হুমায়ুন জানিয়েছেন, পুলিশ-বিডিআরের একটি দল নাইক্ষ্যংছড়ির বাইশারীর বাবুল কোম্পানির ইটভাটার পাশে মকবুলের ঘোনায় ১৫ আগস্ট ভোর ৪.টায় অভিযান চালিয়ে একটি এম-১৬ রাইফেল,১টি এলএমজি, ৫৪৫ রাউন্ড গুলিসহ মংওয়া চাক নামে একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গত সোমবার রাতে নাইক্ষ্যংছড়ির এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেন।" (সংবাদ ২০ আগস্ট ২০০৫ পৃষ্টা ৫)। এভাবে প্রত্যেকটি অস্ত্র উদ্ধারের খবর একটু তলিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে ভিন্ন একটি চিত্র। খোদ জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে জেলা প্রশাসকের নাকের ডগায় আদালত চলাকালে আদালত কক্ষ থেকে বিচারকের বিনা অনুমতিতে সামান্য একজন সেনা ক্যাপ্টেন যদি "আসামীদের" ধরে এনে প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে সন্ত্রাসী হিসেবে তাদের চিত্রিত করতে পারে, তাহলে অন্যান্য এলাকায় সেনারা কি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

মূলকথা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে অবশ্যই একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া উচিত নয়। তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "অস্ত্র উদ্ধার" ও "সন্ত্রাসীর সাথে গুলি বিনিময়" সম্পর্কিত সেনা কমান্ডারদের সরবরাহ করা তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই ছাড়া প্রচার ও প্রকাশ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে।

১৯৯৭ সালে তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জেএসএস সরকারের নিকট অস্ত্রসমর্পণ করার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতি নেই। অথচ তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো অপারেশন উত্তরণ বলবৎ রয়েছে এবং সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর পূর্বের ন্যায় নিপীড়ন নির্যাতন চালাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব খবর পত্র পত্রিকায় ছাপা হয় না বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তির পর কয়েকটি বড় ধরনের সেনা নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। যেমন, গত ৪ এপ্রিল ১৯৯৯ সেনা সদস্য কর্তৃক বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট বাজারে পাহাড়িদের ওপর হামলা চালানো হলে এতে ৫১ জন জখম হয়। ১৬ অক্টোবর ১৯৯৯ বাবুছড়া জোনের সেনা সদস্য কর্তৃক দীঘিনালার বাবুছড়া বাজারে পাহাড়িদের ওপর হামলা চালানো হয় এবং এতে ৩ জন নিহত এবং ২১৬ জন আহত ও ৭৪টি পাহাড়ি দোকান এবং ঘরবাড়ি লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। ১৮ মে ২০০১ সেনা ও পুলিশের উপস্থিতিতে দীঘিনালা বোয়ালখালী মেরুং এলাকায় পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালানো হয়। এতে ৪২টি বাড়ি ভস্মীভূত ও ১৬১ টি বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। ২৬ জুন ২০০১ রামগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালিয়ে ১১০টি বাড়ি ভস্মীভূত ও ১১৭ টি বাড়ি লুটপাট এবং ভাঙচুর করা হয়। ২৬ আগস্ট ২০০৩ মহালছড়িতে ১৪ টি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালানো হলে এতে ৪ শতাধিক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়, চলে ব্যাপক লুটপাট। এছাড়া ২জন পাহাড়িকে হত্যা ও ১০ জন পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণ করা হয়। গত ২৩ জুন ২০০৫ সাজেক ইউনিয়নের ধেবাছড়া, নিউ লংকর, ওল্ড লংকর, হালিম বাড়ি ও সিজক এলাকা থেকে শত শত পাহাড়ি জুমচাষীকে বিডিআর কর্তৃক ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। গত ১ ও ২ অক্টোবর'০৫ দিঘীনালা বাবুছড়ায় তিনজন পাহাড়ি নারীর উপর শারিরীক নির্যাতন চালানো হয়। সম্প্রতি গামারীঢালায় পাহাড়িদের জায়গা-জমি দখল প্রক্রিয়ার সাথে সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এর বিরুদ্ধে জনগণ যাতে প্রতিবাদ করতে না পারে সেজন্য বিজিতলা থেকে ছয়জন নিরীহ জনগণকে গ্রেফতার করা হয়। ৩ এপ্রিল ২০০৬ মাইচছড়িতে পাহাড়িদের উপর সেটলার বাঙালীরা হামলার চালায়। এতে ৩০ জনের অধিক পাহাড়ি আহত হয় এবং চারজন নারী বহিরাগত বাঙালীদের কর্তৃক ধর্ষিত হয়। এসব ঘটনা প্রমাণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উপর কি ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন চলছে। সেনাবাহিনী এবং বহিরাগত সেটলারদের একটি কায়েমী স্বার্থবাদী অংশই যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাধা সেটা বুঝতে কারোর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে "অস্ত্র উদ্ধার" এবং "সন্ত্রাসীদের সাথে গুলি বিনিময়ের" মিথ্যা ও অনেকাংশে বিকৃত খবর প্রচার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানে সেনাবাহিনীর চলমান উপস্থিতিকে জায়েজ করতে অজুহাত খাঁড়া করা। কারণ দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সিতে নিয়োজিত থাকার ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা উপস্থিতি বজায় রাখার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়। বিদেশ থেকে ধার করা কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির কৌশল যেমন তথাকথিত মৈত্রী প্রকল্প, প্যাসিফিকেশন বা শান্তকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর একটি অংশই কেবল লাভবান হয়। জনগণের সাথে মৈত্রীর বদলে সেনাবাহিনীর দূরত্বই বেড়ে ওঠে এবং জনগণ শান্ত হওয়ার পরিবর্তে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাছাড়া, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত সেনাদের মধ্যে অনেকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। তারা গোপনে চাঁদাবাজি, কাঠ ও গোলাবারুদ পাচারসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। অনেক সেনা অফিসার দ্রুত প্রমোশন লাভের ১১ পাতায় দেখুন

অসময়টা

রক্তাক্ত ঘটনাটি আমার এখনো মনে পড়ে

হৃদয় চাকমা

২০০৫ সাল। আমি কুদুকছড়ির এক আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চার পাঁচদিন যেতে না যেতে ১৯ জানুয়ারী সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৩০ টায় হঠাৎ ব্রাশ ফায়ার শুরু হয়। ব্রাশ ফায়ার হওয়ার পর পরই গ্রামের লোকজন সবাই ভয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকে এবং আমার আত্মীয় স্বজনরাও পালিয়ে যেতে থাকে। সবার মুখ থেকে শুনা যাচ্ছে নিশ্চয় ২নাম্বারীরা এসেছে। আমার ভাবী আমাকে রাগের সুরে বললো দাঁড়িয়ে আছো কেন পালিয়ে যাও। দুই নাম্বারীরা অচেনা মানুষ দেখলে ইউপিডিএফ-এর কর্মি মনে করে। শুধু তাই নয় মেরেও ফেলে। তখন আমিও জীবন রক্ষার্থে নিরাপদ স্থান জঙ্গলে পালিয়ে যাই।

ব্রাশ ফায়ার অবিরামভাবে চলছে। প্রায় আধঘন্টার মতো ব্রাশ ফায়ার চলার পর থেমে গেলো। এরপর আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। বাড়িতে পৌছামাত্রই শুনতে পেলাম গণজোয়ার। গ্রামের জনগণ সবাই মিলে দুই নাম্বারীদের তাড়াচ্ছে এবং চিৎকার দিয়ে বলছে- "সন্তু কুগুরুন লেজ বদি দেই যাদন্।" অর্থাৎ সন্তু কুকুরগুলো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

দুই নাম্বারীরা চলে গেলো। এখন দেখতে হবে কোন স্থান থেকে ফায়ার হলো। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম মাটিতে কে যেন শুয়ে পড়ে আছে রক্তে রঞ্জিত হয়ে। পাখির কোলাহল নীরব, আকাশের তারাও নীরবে কাঁদছে। পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে শোকের ছায়া। আমারও অশ্রু নেমে পড়লো দু' চোখ বেয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে নীরবে শুয়ে আছে রক্তমাখা শার্ট পড়ে? লোকজন জানালো ইউপিডিএফ-এর সদস্য যুদ্ধমণি চাকমাকে দুই নাম্বারীরা গুলি করে হত্যা করেছে। দুই নাম্বারীদের নৃশংস হত্যাকান্ডের সেই দিনের ঘটনার আমি একজন প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। যা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি এবং দেখেছি তাদের নৃশংসতা।

এ ঘটনা ঘটে কুদুকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ২০০ গজের মধ্যে। যখন দুই নাম্বারী সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করছে তখন আর্মিরা যেন নিরব দর্শক। সেই দিন যদি আর্মিরা নীরব দর্শক না হতো তাহলে দুই নাম্বারী সন্ত্রাসীদের অবশ্যই গ্রেফতার করতে পারতো। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সেনাবাহিনী এবং জেএসএস-এর মধ্যে একটা যোগসাজশ রয়েছে। অথচ সেনাবাহিনী বিনাদোষে সাধারণ লোকজনকে ধরে নিয়ে এসে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী সাজিয়ে প্রমোশন লাভ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের চোখের সামনেই সন্ত্রাসীরা মানুষ খুন করছে অথচ তারা সেদিন কোন কিছুই করেনি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই সেনাবাহিনী এসে জিজ্ঞেস করছে সন্ত্রাসীরা কোনদিক থেকে এসেছে, কোনদিকে চলে গেছে ইত্যাদি। এত দেরিতে ঘটনাস্থলে আসা মানেই সন্ত্রাসীদের চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? এই সুযোগ দেয়ার ফলে দুই নাম্বারী সন্ত্রাসীরা যখন তখন এসে হামলা করে মানুষ খুন করে যাচ্ছে। এর আগেও কুদুকছড়িতে জেএসএস জঙ্গীদের হামলায় ইউপিডিএফ নেতা নিরণ চাকমা আহত হন। বর্তমানে তিনি পঙ্গুত্ব বরণ করছেন। এ ঘটনায়ও সেনাবাহিনী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয় নি।

আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে জিইয়ে রেখে সেনাবাহিনী জেএসএস-এর সশস্ত্র জঙ্গীদের দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ মানুষ জন হত্যা করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চায়। ফলে জেএসএস-এর জঙ্গীরা একের পর এক খুন, গুম, অপহরণ ইত্যাদি অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৩১ ডিসেম্বর'০৫ স্বাধিকার সংখ্যায় আনন্দ প্রকাশের লেখায় দেখলাম কুসুম্যা চাকমাকে জীবিত অবস্থায় পেট্রোল ঢেলে দিয়ে পুড়ে মেরে ফেলেছে দুই নাম্বারীরা। এ তো নরপশুর কাজ। মানুষ হয়ে মানুষের উপর এ ধরনের নৃশংস, বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণের আমি ঘৃণা ও নিন্দা জানাই। সন্তুর খপ্পরে পড়ে যারা এই ধরনের নৃশংস কাজ করছে তারা নরকে ছাড়া কোথাও স্থান পাবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ মানুষ বর্তমানে খুবই দুর্ভোগের শিকার। জেএসএস জঙ্গীদের কারণে নিজের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। আর উচ্ছেদ হওয়া লোকজনের সহায় সম্পত্তি, জায়গা-জমি জেএসএস জঙ্গীরা ভোগ-দখল করছে। এর চেয়ে গর্হিত কাজ আর কি হতে পারে? মমতাময় পাহাড় ঘেরা আমাদের মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে কখন থেমে যাবে এই রক্ত স্রোত, এই নৃশংসতা ? কখন দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসন হবে? কখন বন্ধ হবে মায়ের ক্রন্দন? ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনের অশ্রু স্রোতে কতবার ভিজে যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ পাহাড়?

পার্বত্য চট্টগ্রামে জেএসএস জঙ্গীদের হামলায় এ যাবৎ যারা শহীদ হয়েছেন,পঙ্গুত্ব বরণ করছেন তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে থাকবেন। তাদের জানাই লাল স্যালুট।

আমার এখনো সন্ধ্যায় সেই ব্রাশ ফায়ারের শব্দ কানে ভেসে উঠে। জেএসএস জঙ্গীদের সেই ব্রাশ ফায়ারের শব্দ। আমরা কি পারি না ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে ? তাই আসুন আমরা সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে সুন্দর একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ার কাজে নেমে পড়ি। ■

কর্ণফুলী চা বাগানঃ সাঁওতালদের বন্দিশালা

আনন্দ প্রকাশ চাকমা

চট্টগ্রাম জেলাধীন ফটিকছড়ির পাহাড়ে রয়েছে কর্ণফুলী চা বাগান। ১৮৬৪ সালে ম্যাকলিন এ্যান্ড কিলবার্ন কোম্পানী নামে এক ইংরেজ কোম্পানী এই চা বাগানের কাজ শুরু করে। বাগানের মোট আয়তন ২,৬৬,০৬১ হেক্টর। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭বার বাগানের মালিকানা রদ-বদল হয়েছে। সম্প্রতি বছর দুই আগে ব্র্যাক (ইজঅঈ) নামে এক এনজিও সংস্থা এটিকে কিনে নিয়েছে। এক একবার হাত বদল হওয়ার পর বাগানটি সংস্কার করা হয় বিভিন্নভাবে। সেই ধারাবাহিকতায় ব্র্যাকও হাত দিয়েছে সংস্কারে। শুধু সংস্কার নয় রীতিমত পরিধি বাড়ানোর তৎপরতাও চলছে। অনেক পাহাড়ি অভিযোগ করেছেন কোম্পানীর (বাগান কর্তৃপক্ষ) লোকজন এবার বাগানের নির্দিষ্ট পরিসীমা ছাড়িয়ে তাদের (পাহাড়িদের) ভিটেমাটিও বেদখল করে নিচ্ছে। প্রতিবাদ করলে হুমকি দেয়া হয়। এভাবে চলতে থাকলে পাহাড়িদের অনেক ভূ-সম্পত্তি ব্র্যাক গ্রাস করে নেবে। কাজেই বিষয়টি সচেতন মহলকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

ব্র্যাক এর কর্মতৎপরতা দেখে মনে হয় শুধুমাত্র চা উৎপাদন বাড়িয়ে এনজিওটি খুশি নয়, পর্যটক আকর্ষণ করারও এর এক অঘোষিত উদ্দেশ্য। এতে করে উৎপাদন ও পর্যটন এ দুই খাতে লাভের অংক বাড়বে। কারণ এনজিওদের মৌলিক চরিত্র আমাদের বুঝতে হবে। বিড়াল যেমন মাছের দুর্গন্ধ (তাদের জন্য সুগন্ধিস্বরূপ) পেলে আর চুপচাপ থাকতে পারে না, তেমনি লাভের গন্ধ পেলে এনজিওগুলো করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। খেটে খাওয়া মানুষের তিল তিল উপার্জনে ভাগ বসিয়ে ও নানাভাবে শোষণ করেই এনজিওগুলো বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠে। কর্ণফুলি চা বাগানকে সংস্কার করা হচ্ছে দৃষ্টি নন্দনের জন্য। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রতিটি জায়গায় মৎস্য চাষের নামে বাঁধ দিয়ে সৃষ্টি করা হচ্ছে ছোট ছোট লেক। বাগানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে সবুজ বাগানের মাঝে নীল জলরাশি দেখে পরিপূর্ণ তৃপ্ত হন। অস্ফুট স্বরে গুন গুনিয়ে হয়তো গানও করে থাকবেন। ক্যামরায় ধারণকৃত সেই দৃশ্যের রঙিন ছবি কতোই না মনোরম, অনিন্দ্য সুন্দর! যদি প্রশ্ন করা হয় এত সব সৌন্দর্য্যের রূপ গড়ে তোলা হয়েছে কোন অসুন্দরের উপর ? কার কান্নার রোল ছাপিয়ে তুমি হাসছ ? কার অশ্রু ধারার সমষ্টিকে তুমি নীল জলরাশি মনে করে পুলকিত হচ্ছ ?

১৮৬৪ সালে এই চা বাগান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাঁওতালরা বাগানের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত। গত দেড়শ' বছরে বাগানের বহু উন্নতি ঘটেছে, সংস্কার হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে। কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দ্রুত চা প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। কোম্পানীর আয় বেড়েছে বহুগুণ। নতুন অফিস উঠেছে। কর্মকর্তা কর্মচারীরদের জন্য থাকা খাওয়ার নিত্য নতুন সুযোগ সুবিধা বাড়ছে। মোটামুটি দেড়শ' বছরে বাগানের আমূল সংস্কার ঘটেছে। কিন্তু এই দেড়শ' বছরে কোন পরিবর্তন হয়নি শ্রমিক সাঁওতালদের জীবন যাত্রার। তারা বংশ পরম্পরায় এই চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছেন। তারা শুধু দেখেছেন তাদের তিল তিল পরিশ্রমের ফলে বাগানের অবস্থা পরিবর্তন হতে। কিন্তু পাশাপাশি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন কখনো দেখেননি। অতি কষ্টে তাদের সংসার চলে। দৈনিক ২৯.৮৫ টাকা মজুরীতে একটা পরিবারের ভরণ-পোষণ কিছুতেই সম্ভব হয় না। তাই তারা অভাব-অনটন কিছুটা লাঘবের জন্য বাগানের আশেপাশের পতিত জমিগুলোতে ভাগাভাগি করে ধান চাষ করেন। এতে করে তাদের অন্তত কিছুটা সাশ্রয় হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে তাদের সেই পথও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সাঁওতালরা যাতে উপার্জনের কোন বিকল্প পথ না পেয়ে আজীবন একমাত্র চা বাগানে কাজ করতে বাধ্য হয় সেই হীন উদ্দেশ্যেই কোম্পানী এখন সেই ধান্য জমিগুলি বাঁধ দিয়ে পানির নীচে তলিয়ে দিয়েছে। আশার বাণী শুনানো হচ্ছে সেখানে মৎস্য চাষ করা হবে। দরিদ্র শ্রমিকদের চাষ করার ন্যুনতম সুযোগটুকুও বন্ধ করে দিয়ে কোম্পানীর চেলারা এখন সেখানে রঙিন ছবি তুলছেন। দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। পর্যটক আকর্ষণ করছেন। ধিক্ তাদের এই বিকার মানসিকতা। সাঁওতালদের জীবন শক্তি আজ ব্র্যাক নামক এনজিও-কোম্পানীর পদতলে নিষ্পেষিত ও নিঃশেষিত। তাদের বঞ্চনাভরা জীবন কিভাবে চলছে সেদিকে একটু আলোকপাত করা যাক।

১. কর্ণফুলী চা বাগানে কর্মরত সাঁওতালদের জীবন সংগ্রাম দেখলে যে কারোর দাস সমাজের কথা মনে হবে। সাঁওতালরা প্রত্যেকেই দাস আর বাগানের কর্মচারী কর্মকর্তারা দাসপ্রভু। শ্রমিকরা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি করে মরছেন। বাবুরা (কর্মকর্তা-কর্মচারীরা) করে যাচ্ছেন কড়া তত্ত্বাবধান। তত্ত্বাবধান তো নয় যেন যমের পাহারা! সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটলে নির্দয় মারপিট। কুতুব বাবু নামে বাগানের এক কর্মকর্তা সবচেয়ে বেশি মাত্রায় লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও নির্যাতন করে বলে সকল শ্রমিকের অভিযোগ। সে নাকি শ্রমিকদের সাথে গরুর চেয়েও অধম ব্যবহার করে থাকে। যাকে ইচ্ছে তাকে মারধর করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে জাত্যাভিমানটা অত্যন্ত তীব্র বলে শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন। শরীরের উপর যত আঘাত নির্যাতনই নেমে আসুক শুধু অশ্রু বিসর্জন দিয়ে নীরবে জীবনের ঘানি টানা ছাড়া তাদের বিকল্প কোন অবলম্বন নেই।

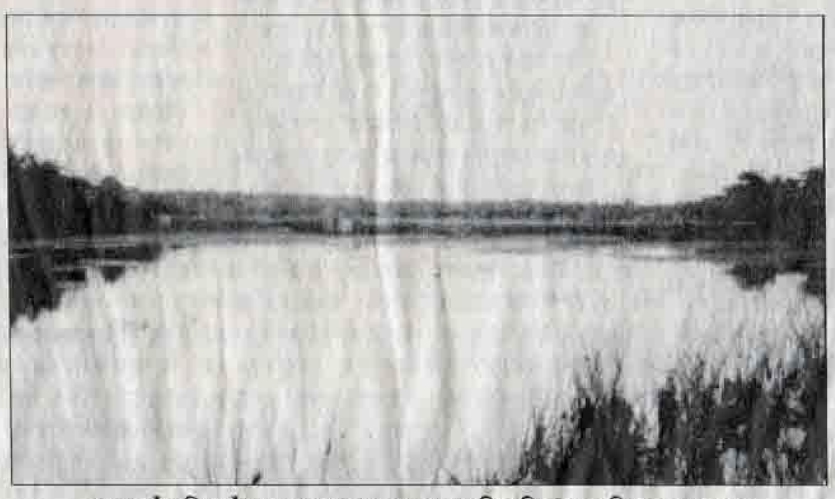

এভাবে বাঁধ দিয়ে সাঁওতালদের আবাদযোগ্য ধান্য জমি পানির নীচে তলিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. বর্তমানে শ্রমিকদের কাজের মজুরী মাথাপিছু ২৯ টাকা ৮৫ পয়সা। তাও আবার নির্ধারিত মাত্রায় কাজের অগ্রগতি দেখাতে না পারলে মজুরীর অংশ থেকে কেটে রাখা হয়। বর্তমান দুনিয়ায় কোথাও এ রকম মজুরীর নজীর রয়েছে বলে জানা নেই। এই আকাশ ছোঁয়া দ্রব্য মূল্যের দেশে এত স্বল্প মাইনা দিয়ে ছেলে-পুলে, পরিবার-পরিজন নিয়ে কিভাবে প্রতিটি সংসার চলে তা ভাবলে খুবই কষ্ট লাগে।

৩. পুরো বাগান এলাকা রক্তছড়ি, টেকবাড়িয়া, ফেন্নুয়া ও কুতুকছড়ি এই ৪ ডিভিশনে বিভক্ত। মোট ৭-৮ শ' পরিবারের মত সাঁওতাল এখানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। এই ব্যাপক এলাকা ও বৃহৎ জনসংখ্যার জন্য মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাতে শিক্ষক মাত্র ২ জন। অন্যদিকে পেটের দায়ে ছেলে বুড়ো সবাইকে কাজ করতে হয় বাগানে। ফলে ছেলে মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ভবিষ্যতে তাদের মধ্য থেকে নতুন প্রজন্ম সুশিক্ষিত হয়ে নিজেদের এ বন্দীদশার অবসান ঘটাতে পারবে এমন আশাও ক্ষীণ।

৪. পুরো এলাকার জন্য কোম্পানীর পরিচালনাধীন একটি নামমাত্র হাসপাতাল রয়েছে। তাতে পত্র আছে ঔষধ নেই। অর্থাৎ ডাক্তার বাবু হাফ নজর রোগী দেখে একটা ব্যবস্থাপত্র (চৎবংপৎরঢ়ঃরড়হ) লিখে দেন। গাড়ি ভাড়া ৩০ টাকা খরচ করে ঐ ঔষধ নিয়ে আসতে হয় ফটিকছড়ি থেকে। যেখানে দু' বেলা খাওয়া নিয়ে টানাটানি অবস্থা সেখানে তারা ঔষধের পয়সা পাবেন কোথায় ? কোম্পানী তার শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে না। ফলে স্বাস্থ্য সেবা থেকে এরা বঞ্চিত।

৫. অতি দরিদ্র জীবন-যাপন করায় কোন রকম নুন-ভাত (তাও পর্যাপ্ত নয়) যোগার করা সম্ভব হলেও স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ন্যুনতম ক্যালোরি সম্পন্ন যেসব খাদ্র দ্রব্যের নিতান্তই প্রয়োজন যেমন ফল-মুল, টাটকা শাক-সবজি, ডিম-দুধ, মাছ-মাংস এসব তাদের ভাগ্যে জুটে না। ফলে ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ বলতে গেলে পুরো সম্প্রদায়ই পুষ্টিহীনতায় ভুগে। বিভিন্ন চর্মরোগ, পেটের অসুখ, পোলিও, রাতকানা, ডিপটেরিয়া, পেট মোটা, হাত-পা শীর্ণ ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা লেগেই রয়েছে। বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে চায় শুধু কাজ আর কাজ। কিন্তু শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকে একটুখানি নজর রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না।

৬. কারোর পায়ে দান্ডা বেড়ি , সরকারীভাবে কারা রক্ষী , চারিদিকে অনাতিক্রম্য প্রাচীর নেই বটে, কিন্তু এই বাগানটি বাস্তবিকই সাঁওতালদের এক বন্দিশালা। বাগানের কাজ ছেড়ে বসে থাকা বা বাইরে যাবার একটুখানি অবকাশ নেই। কাজে একদিন অনুপস্থিত থাকা মানেই নির্ঘাত অনাহার। পেটের দায়ে সকাল সন্ধ্যা বাগানে কাজ করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

৭. সম্প্রতি তাদের ধান্য জমিগুলির উপর মৎস্য চাষের নামে বাঁধ নির্মাণ করায় সামান্যতম বাড়তি উপার্জনের উপায়ও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কোম্পানীর অভিসন্ধি হচ্ছে সাঁওতালদের সমস্ত রকমের বাড়তি উপার্জনের পথ বন্ধ করে দিয়ে আজীবন বাগানে কাজ করে যেতে তাদেরকে বাধ্য করা।

সাঁওতালদের জীবন আজ শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট। কুতুব বাবুর মত জাত্যাভিমানী বাগানের কর্মকর্তারা তাদেরকে মানুষ হিসেবেও গণ্য করে না। দেখে শুনে মনে হয় শুধুমাত্র চা বাগানে কোম্পানীর ঘানি টানার জন্যই এই চার পাঁচ হাজার সাঁওতালের জন্ম। আর কোম্পানীও সব ধরনের মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে সাঁওতালদের জীবনের সব শক্তি নিংড়ে নিচ্ছে।

৮. বাগানে বর্তমানে নিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা ১,৭০০ জন। এরা সবাই সাঁওতাল। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সবাই (২/৩ জন বাদে) বাঙালী। সেখানে সব ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য রয়েছে বলে শ্রমিকরা জানান। তাদেরকে এমনভাবে অন্ধকারে রাখা হয়েছে যা থেকে বিগত দেড়শ' বছরে তো পরিত্রাণ মেলেনি আর আগামী দেড়শ' বছরেও (এভাবে চললে) যে ভাগ্যের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটবে তার আশাও নেই। কারণ উন্নতি লাভের কোন শর্ত তাদের সামনে খোলা নেই।

৯. কোম্পানীর মালিকানায় বহু টিলা এমনিতেই পড়ে রয়েছে। সেখানে পরিবেশ সুন্দর রেখে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বসবাস করা যায়। কিন্তু তাদেরকে সেই সুযোগ দেয়া হয় না। তাদেরকে সীমিত জায়গার মধ্যে এমন অবস্থায় গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে তা বাজার নাকি গ্রাম চেনা যায় না। স্যানিটেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় সেই জনপদগুলোর অবস্থা আরো ভয়ংকর।

১০. সাঁওতালদের জীবন সর্বদাই নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের মধ্যে কাটে। ফটিকছড়ি থানার সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো প্রায়ই তাদের উপর অত্যাচার চালায়। কারণে অকারণে মারধর ও জোর জুলুম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই হচ্ছে কর্ণফুলী চা বাগানে সাঁওতাল শ্রমিকদের বর্তমান জীবন চিত্র। যে সাঁওতালরা ১৮৫৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তীর-ধনুক, লাঠি-সোটা নিয়ে বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যা ইতিহাসে "সাঁওতাল বিদ্রোহ " নামে পরিচিত; যে সাঁওতালরা ১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারী ঐতিহাসিক "তেভাগা আন্দোলনের সূচনায় দিনাজপুর জেলার তালপুকুর গ্রামে পুলিশের গুলিতে প্রথম শহীদ (অধিয়ার শিবরাম মাঝি) শহীদ হয়েছিলেন, সেই বীরত্ব গাঁথা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায় আজ চা বাগানের এক কোণে শোষণ-নিপীড়নে পিষ্ট হচ্ছে। তখন সাঁওতাল বিদ্রোহ সফল হয়নি বটে, কিন্তু গোটা উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তা একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। আজ উপমহাদেশে স্বাধীন জাতি হিসেবে যারা পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত, পরাক্রমশালী ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরদ্ধে তাদের আগেই এই সাঁওতাল সম্প্রদায়ই অসম সাহসে গর্জে উঠেছিলেন এটাই সত্য। পরাধীনতার শৃংখল চুরমার করে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে ভারতবাসীর সামনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এ সম্প্রদায়। যে পথে পরবর্তী প্রায় একশ' বছরে ভারত ও পাকিস্তান লাভ করে স্বাধীনতা। একই পথে পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামে ভূখন্ডেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে।

কিন্তু পরাধীনতা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকারী সেই সাহসী জাতির ভূমিকার কথা কি এখন কেউ স্বীকার করে ? বর্তমানের সভ্য (?) শাসক গোষ্ঠি ইতিহাস সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা অথচ সুমহান মর্যাদার অধিকারী সাঁওতালদের কি মানুষের মর্যাদা দিয়ে বিচার করে ? না, করে না। বিচার করার প্রয়োজনও বোধ করে না। কারণ শাসক দলগুলোর নির্বাচনী প্রতীক নৌকা, ধানের শীষ, দাঁড়ি পালা, লাঙ্গল ইত্যাদির আড়ালে তাদের দৃষ্টি এবং বিচারবোধও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সাঁওতালদের জীবন আজ শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট। কুতুব বাবুর মত জাত্যাভিমানী বাগানের কর্মকর্তারা তাদেরকে মানুষ হিসেবেও গণ্য করে না। দেখে শুনে মনে হয় শুধুমাত্র চা বাগানে কোম্পানীর ঘানি টানার জন্যই এই চার পাঁচ হাজার সাঁওতালের জন্ম। আর কোম্পানীও সব ধরনের মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে সাঁওতালদের জীবনের সব শক্তি নিংড়ে নিচ্ছে। অন্য কোন সম্প্রদায়কে দিয়ে কোম্পানী এ পরিমাণ ফায়দা লুটতে পারে না। দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী বহু বাঙালী শ্রমিককেও সাঁওতালদের মত খাটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তাদের জন্য কোম্পানী আলাদা থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল। সাঁওতালদের চেয়ে বাঙালী শ্রমিকদের অধিকতর সুযোগ সুবিধাও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও কেউই টিকতে না পেরে কয়েকদিন কাজ করার পর তারা চলে যায়। দরিদ্র সীমার নীচে জীবন যাপনকারী কষ্ট সহিষ্ণু বাঙালীরাও যেখানে নিম্ন মজুরী ও দুর্বিসহ কাজের পরিবেশে ঠিকতে পারেন না, সেখানে সাঁওতালদেরকে যুগ যুগ ধরে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে।

কবি, সাহিত্যিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পূজারীরা চা বাগানের বাহ্যিক সবুজ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হন। তাদের ভাষায় বাগানের রূপ অনিন্দ্য সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। সারি সারি চা গাছের মাঝে ঘামে ভেজা বিবর্ণ ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের কাজের দৃশ্যতেও তারা খুঁজে পান সুন্দরের সমারোহ। কিন্তু দুঃখে যাদের জীবন গড়া সেই নিপীড়িত নিঃস্ব শ্রমিকদের কঠিন জীবন গাঁথা কবিদের ভাষায় স্থান পায় না। সৌন্দর্য পূজারী চোখ গুলোতে এই দৃশ্য ধরা দেয় না।

সব জিনিষের একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম হলে অঘটন ঘটে। ধৈর্য্য এবং সহ্যও অসীম নীল আকাশ নয়। তারও একটা পরিসীমা রয়েছে। সাঁওতালদের উপর শোষণের যে স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে তা মানবিকতার সব সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। এরা বিদ্রোহী জাতি। তাদের রক্তের ধমনীতে বিদ্রোহের কণিকাগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েনি। সীমাহীন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে আশ্চার্য হবার কোন কিছু থাকবে না। ১৫. ০১. ০৬

মিথ্যা মামলায় ১৬ মাসের কারাজীবন

নয়ন চাকমা

কারাগারের লৌহ গেটে ঢুকার সাথে সাথে কারা রক্ষি, হাজতি সবাই আমাকে খাঁটি বাংলায় সম্বোধন করছে "গরু" বলে। ব্যবহারও করা হয় গরুর মত। চেক করেনি শরীরের এমন কোন জায়গা নেই, পুরুষাঙ্গ ও মলদ্বার থেকে আরম্ভ করে মুখ গহ্বর, কান ও নাসিকা রন্ধ্র পর্যন্ত কোন কিছু বাকী রাখেনি।

তারিখটা ৮ আগষ্ট ২০০৪ রবিবার। কুদুকছড়ি বাজারে সপ্তাহিক হাট দিবস। বাজারে যাবার আগে গোসলটা সেরে নিতে কুদুকছড়ি তিবিরা পাড়ার ব্রীজের ঘাটে যাই। যেই না পানিতে নামতে যাচ্ছি, রাস্তা থেকে কয়েকজন আর্মি আমাকে তাদের কাছে যেতে বলে। আমি গেলাম। তারা আমাকে কোন কিছু না বলে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো। একেবারে চোখও বেঁধে দিলো। আটক করার কারণ জানতে চাইলে তারা আমাকে মারধর করতে আরান্ত করে। আমি আর কোন কথা বলার সুযোগ পেলাম না। মারতে মারতে তারা আমাকে কুদুকছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এমনকি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার সময় জীপে চড়া অবস্থায়ও মেজর জিয়ারুল (৪০ ই বি) এবং অপর এক মেজর যাচ্ছেতাই মারধর করে। তারা আমার কাছে জানতে চায় আমার হাতিয়ার কোথায় রেখেছি। কোন সত্য ভাষণ তারা শুনতে রাজী নয়। আর মিথ্যাও বলি কিভাবে। মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিলে যে ছেড়ে দেবে তারও বা গ্যারান্টি কি? তাই নির্দয় নির্যাতনের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অকথ্য নির্যাতনের এক পর্যায়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার অচেতন ক্ষত-বিক্ষত শরীরের উপর তারা আরো কি কি করেছে আমি আর জানি না। শেষে যখন জ্ঞান ফিরলো তখন বুঝতে পারলাম আমি চলন্ত গাড়িতে। চোখ তখনো গামছা দিয়ে বাঁধা। সন্ধ্যার দিকে আমাকে হস্তান্তর করা হয় রাঙ্গামাটির কোতোয়ালী থানায়। চোখ তখন খোলা। অনেক পুলিশ আমার কাছ থেকে জানতে চায় আমি কি মামলার আসামী। আমাকে কি মামলা দেয়া হয়েছে তখনো আমি কিছুই জানি না। আর সত্য কথা বলতে কি নিজেকে আসামী বলে স্বীকার করতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু করার কিছুই নেই। জোর যার মুলুক তার। তখন আমি তো আর আমি নই। আমার সব কিছুই তখন নির্ভর করছে অন্যের উপর। থানার কর্তা ব্যক্তিদের উপর।

একদিন পর ৯ আগষ্ট ২০০৪ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে ৮ তারিখ ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত ছিলাম "সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ" (তবে অধিকারহারা নির্যাতিত জাতিসত্তার একজন হিসেবে)। আর্মিরা আটক করার সাথে সাথেই আমার অবনতি হলো 'মানুষ' থেকে 'আসামীতে'। আবার ২৪ ঘন্টার মাথায় জেল খানার লৌহ কপাটের ভিতর ঢোকার সাথে সাথেই আমার স্ট্যাটাস আরো এক ধাপ নিচে নেমে গিয়ে হলো 'গরু'। একেবারে জাত পরিবর্তন। মানব থেকে পশুতে। কারাগারের লৌহ গেটে ঢুকার সাথে সাথে কারা রক্ষি, হাজতি সবাই আমাকে খাঁটি বাংলায় সম্বোধন করছে "গরু" বলে। ব্যবহারও করা হয় গরুর মত। চেক করেনি শরীরের এমন কোন জায়গা নেই, পুরুষাঙ্গ ও মলদ্বার থেকে আরম্ভ করে মুখ গহ্বর, কান ও নাসিকা রন্ধ্র পর্যন্ত কোন কিছু বাকী রাখেনি। কি খুঁজেছে তা আমি জানি না। আঘাতের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ তখন যায় যায় অবস্থা। নিজেকে মনে হয়েছিল বিড়ালের কব্জায় এক নিরূপায় ইঁদুর। ইচ্ছামত রসিকতা করার পর কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে হাজতি ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দেয়। পরের দিন দেয়া হলো একটা কার্ড। তাতে লেখা আছে আমি বাংলাদেশ দন্ডবিধি ১৯ (ক) ও ১৯ (চ) ধারার প্রকৃত আসামী। ঐ ধারা কি আমি তখন জানতাম না। অন্যান্য হাজতি বন্ধুরা আমাকে বুঝিয়ে দিলো যে, ঐটা অস্ত্র আইনের মামলা। অস্ত্রসহ ধরা পড়লে উক্ত ধারা দেয়া হয়। অর্থাৎ আমি অস্ত্র সহ ধরা পড়েছি। কি অবাক কান্ড! এই বুঝি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ব্যবস্থা! আমাকে যখন আটক করা হয় তখন আমার হাতে ছিল মাত্র একটি লাইফবয় সাবান। ঐ সাবানটি যদি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দু'জন মেজর র‍্যাংকের অফিসারের কাছে বে-আইনী অস্ত্র বলে পরিগণিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এদেশে বিশেষত: পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ নিগৃহীত জনতাকে সেনাবাহিনী লাইফবয় সাবানের চাইতেও বড় কিছু অস্ত্র তুলে নেয়ার জন্য প্ররোচিত করছে বলতে হবে।

জেল খানায় যে শত শত বন্দি চোখে পড়ছে আমার অবস্থার নিরিখে তাদের কাউকে আর সত্যিকারের অপরাধী বলে মনে হলো না। ভাবতে লাগলাম এদেরকেও নিশ্চয় আমার মত করে রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি থেকে ধরে এনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে এই বন্দি শালায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর কর্মবহুল জীবনের মূল্যবান সময় পঁচিয়ে দেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে দেখলাম আমার ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল। অধিকাংশকেই ধরে খেয়াল খুশী মত আসামী বানিয়ে পরে আসামী থেকে 'গরুতে' রূপান্তরিত করা হয়েছে।

জেলে ঢুকানোর ২দিন পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ৩ দিনের রিমান্ডে। ৩ দিনে নির্যাতনের সাধ না মিটায় ইন্টেরোগেশন সর্দাররা (অফিসার বা কর্মকর্তা বলতে ঘেন্না হয়) আরো ২ দিন মেয়াদ বাড়িয়ে মোট ৫দিন রিমান্ডে রেখে নির্যাতন চালায়। সেখানে ৫দিন ধরে যে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে তা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার জানা নেই। অমানবিক নির্যাতনের কারণে পর পর তিন বার অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তাদের প্রশ্ন শুধু ইউপিডিএফ কর কেন ? অস্ত্র কোথায় পেয়েছ ? কি কি অস্ত্র আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ৫দিন পর্যন্ত তো কোন খাবারই দেয়া হয়নি, তার উপর সমানে চলেছে শারিরীক নির্যাতন। এত নির্যাতন করার পরও নির্যাতনের সাধ না মিটায় অবশেষে ইন্টেরোগেশন সর্দারের এক কনস্টেবলকে বৈদ্যুতিক শক লাগানোর হুকুম দেয়। তখন ঐ কনস্টেবল তার স্যারকে বলে যে, "স্যার আসামী অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কারেন্টের শক লাগালে সে নিশ্চিত মারা যাবে।" এই কথা শুনে ঐ পিশাচ "স্যারেরা" 'তাই নাকি' বলে ইন্টেরোগেশন সেল থেকে বেরিয়ে যায়। শেষ হয় ৫ দিনের অবর্ণনীয় রিমান্ড। তারপর আবার 'গরু' সার্টিফিকেট নিয়ে কারাগারে।

নয়ন চাকমা

রিমান্ডের পর পুরো ২৬ দিন জেল খানার মেডিকেল ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিতে হলো। শুশ্রুষার ক্ষেত্রে জাহাঙ্গির নামে একজন হাজতি আমাকে যে মানবিক সহযোগিতা করেছে তা ভুলতে পারব না। দীর্ঘ ১৬ মাস বন্দি জীবনের দুঃসহ মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়লে আপনাতেই দপ্ করে রক্তে আগুন জ্বলে উঠে। ইচ্ছে করে অত্যাচারী শাসক-শোষক গোষ্ঠিকে উৎখাত করতে যে কোন পথ বেছে নিতে। স্বজাতির মধ্যে যারা এদের সাথে আপোষ করে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে তাদের প্রতি ঘেণ্নায় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। কারাগারে দেখেছি জাতিগত বৈষম্য, দেখেছি অন্যায় অবিচার। সেখানে দেখেছি মানবিক মুল্যবোধ কতটুকু বিপন্ন, দেখেছি টাকার যাদু। কারাগারে বন্দিদের সাধারণ সম্বোধন হচ্ছে "গরু"। কিন্তু এই 'গরুদের' হাতে কিছু টাকা থাকলে কারারক্ষি মিঞা সাবদের তখন 'গাধা' বানাতে কোন সময় লাগে না। ন্যায়-অন্যায়, আইন-বেআইন সেখানে সব খোলা মার্কেটে বেচা-কেনা চলে। জেলার, জমাদার, মিঞা সাব, ওয়ার্ড মেট-- এদেরকে মালিশ (জেল খানার ভাষায় সিস্টেম) করতে পারলে জীবনের সবচেয়ে নিরাপদ ও আরামের জায়গা হচ্ছে জেলখানা। জঙ্গী আক্রমণ বা সড়ক দুর্ঘটনার কোন আশংকা নেই। রুচি সম্মত খাদ্যদ্রব্য, নরম বিছানা, চাকর-বাকর ইত্যাদির কোন অভাব হবে না। আপনি খারাপ লোক হলেও যদি কায়দা করে কিছু টাকা রাখতে পারেন তাহলে আপনার অসদ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মিঞা সাবদের কিছু সিস্টেম করাতে পারলে তারা আপনার টার্গেটকে কোন কারণ ছাড়াই প্রত্যক্ষ ও নগদে রাম ধলাই দিয়ে দেবে। পাজি লোকদের এটাও একটা পেশা।

জেল খানায় ঢুকানোর সাথে সাথে জমাদার, মেট, মিঞা সাব ইত্যাদি জেল খানার রথি-মহারথিদের সাথে দেয়া নেয়ার কথা বার্তায় যদি একটা মীমাংসায় পৌঁছতে না পারা যায়, তাহলে অমানুষিক কষ্টের আর সীমা থাকবে না। সিস্টেম না করলে আপনাকে ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে ল্যাট্রিনে দাঁড়িয়ে রাখা হবে। এটাকে তারা রসিকতা করে নাম দেয় ল্যাট্রিন ফিটিং। রাত্রে শুতে দেবে ল্যাট্রিনের দরজায় স্যাঁত স্যাঁতে স্থানে মাথা রেখে ইলিশ ফাইলে। অর্থাৎ বড় খাঁচায় মরা ইলিশ মাছ যেভাবে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয় ঠিক সেইভাবে। তাও চলবে আবার উত্তম মধ্যমের মধ্য দিয়ে। কাজ করতে হবে খালি হাতে। ল্যাট্রিনের তলা খালি হাত ঢুকিয়ে পরিষ্কার করতে বাধ্য করে। এসবের অর্থ হচ্ছে টাকা আদায়ের জন্য চাপ দেয়া। যতদিন টাকা দিতে না পারেন ততদিন আপনার উপর এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতন চলতে থাকবে। আর বুঝ দিতে পারলে মুহূর্তেই আপনার অবস্থার পরিবর্তন হবে।

এসবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কোন অবস্থা নেই। যে অভিযোগ করবে তার উপর নেমে আসবে আরো চরম নির্যাতন। কারণ জেলার জমাদার, কারারক্ষী মেট, ডাক্তার এরা সবাই একই গর্তের শিয়াল। সবার যোগসাজশেই টাকা আদায়ের এহেন 'পেরাপেরি'। মাঝে মাঝে ডিসি তদন্তে যান। তার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি সোজাসুজি বলেন, "তোমরা এখানে কি সুখে থাকতে আইছ নি ? এটা কষ্টের জায়গা। কষ্ট তো পাবেই।" এ বুলি আউরিয়ে আর কারা কর্তৃপক্ষের উপর্যপুরি ঘন ঘন সালাম গ্রহণ করতে করতেই ডিসি'র মহা তদন্ত শেষ হয়ে যায়। ডিসি সাহেবের একটু বুঝা উচিত যে, সহ্যের চরম সীমায় না পৌছলে কোন বন্দি কারা রক্ষীর বিরুদ্ধে সামনা-সামনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার সাহস পাবে না।

জেলখানা মানেই চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। নিয়ন্ত্রণের আধার। সেখানে সরকারের মৌলিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু প্রতিফলনের যে চিত্রটি আমার চোখে পড়েছে তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক ও বেদনাদায়ক। সেখানে দেখলাম মুসলমান বন্দিরা যখন নামাজ পড়েন বা কোন প্রকার ধর্মীয় আচার-আচরণ করেন তখন অন্য ধর্মাবলম্বীদের নীরবতা পালন করতে হয় এবং সেটা খুবই কড়াকড়ি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, হিন্দুরা যখন কোন ধর্মীয় আচার-আচরণ করি, তখন মুসলমান বন্দিদের চেঁচামেচিতে মাছের বাজার বসে যায় এবং তা ঘটে কারা রক্ষীদের সশরীর উপস্থিতিতে।

রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারের সরকারি টেলিভিশনগুলি বন্দিদের কাছ থেকে টাকা 'পেরানোর' (হাতিয়ে নেয়ার) বিশেষ যন্ত্র এবং কারা কর্তৃপক্ষের পারিবারিক চাঁদার বাক্স ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। টেলিভিশনের ছবি বা শব্দ সামান্য অস্পষ্ট হলে এ্যান্টেনা বা নব ঘুরিয়ে তা সহজেই ঠিক করা যায়। কিন্তু জেল খানার টিভি গুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট করে ঘোষণা দেয়া হয় যে, 'টিভি খারাপ হয়েছে। ম্যাকানিকের কাছে নিয়ে মেরামত করতে হবে। ....এত হাজার টাকা লাগবে। আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে সকল বন্দিরা মিলে টাকা যোগার করে দাও।" ছবির বদলে অন্ধকার টিভি পর্দার পাশে জলজ্যান্ত মানুষের অভিনয় শেষ। তারপর শুরু হবে টাকার জন্য বন্দিদের উপর নানান কিসিমের বঞ্চনা। নিরুপায় মানুষের উপর এহেন নির্দয় ব্যবহার ভাবতে খুবই খারাপ লাগে। এক্ষেত্রে একটা বাস্তব ঘটনার কথা বলি, " নান্যাচর বাজারে কালা হাঙ্গা নামে এক রেডিও ম্যাকানিক ছিলেন। তার বাড়ি সাপমারা। বগাছড়ি থেকে একদিন এক লোক তার সাধের রেডিওটি ঐ ম্যাকানিক সাহেবের কাছে নিয়েছিলেন মেরামতের জন্য। সমস্যাটা হলো 'রেডিওটা মাতে না'। ম্যাকানিক সাহেব রেডিওটি খুলার সাথে সাথে ব্যাধিটা ধরতে পেরে মালিককে একটু ঘুরে আসতে বললেন। এরি মধ্যে দক্ষতার সাথে মেরামত কাজ নিমিষেই শেষ। কিছুক্ষণ পর মালিক এসে দেখেন তার রেডিওটি পূর্বের মত উচ্চঃস্বরে পলীগীতি গাইছে। তিনি খুশিতে হাসলেন এবং ম্যাকানিকের কর্ম নৈপুন্য প্রশংসা করে মেরামত খরচ বাবদ (দাবী অনুযায়ী) ১৫০ টাকা প্রদান করে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে মনের আনন্দে চলে গেলেন। " বাস্তব ঘটনা এখানে বাস্তবভাবে শেষ। কিন্তু ভিতরটা একটু খতিয়ে দেখতে হয়। এই কাজের মধ্যে ম্যাকানিক সাহেবকে প্রশংসা করবে নাকি ঘৃণা করবো ? কারণ রেডিওটির কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ খারাপ হয়নি। বেচারা মালিক বুড়ো মানুষ ভুলক্রমে ব্যাটরিগুলি উল্টো-পাল্টা ভাবে ঢুকানোয় রেডিওটার ঐ অবস্থা হয়েছিল। আর সেই ভুলটাকে পুঁজি করে ম্যাকানিক সাহেবের ১৫০ টাকা আদায় করাটা নিশ্চয় ন্যায্য নয়। একজনের দুর্বলতাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটার মানসিকতা কোন মতেই প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না।

দীর্ঘ ১৬মাস অন্তরীণ থেকে যা দেখলাম তাতে তীব্র ঘৃণা জন্মে শাসক-শোষক গোষ্ঠির অপশাসন ও শোষণের প্রতি। সেখানে যতজন পাহাড়ি বন্দি দেখেছি শতকরা সত্তর থেকে আশি জনই তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের সাথে কোনরূপ সম্পৃক্ত নয়। অধিকাংশ নিরপরাধ পাহাড়িদের ধরে অপরাধী বানিয়ে বন্দি রাখা হয়েছে। এদের সবাইকে আমি বন্দি বলতে পারি কিন্তু আসামী বলতে পারি না। এরা হলেন ষড়যন্ত্রের বলি। না হয় জাতিগত বিদ্বেষ, নয়তো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। সেই শত শত নিরপরাধ অপরাধীর মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। কর্মবহুল জীবনের মুল্যবান সময় নষ্টের কথা চিন্তা করে এখনো বুকের ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। দুঃখে, ক্ষোভে অপমানে জেলে থাকতে ইচ্ছে করতো দেয়াল টপকে বাইরে এসে শয়তান শাসক গোষ্ঠির বংশকে কচু কাটা করতে।

অবস্থাদৃষ্টে এবং বাস্তবিক এটা সত্য যে, কোন জাতির রাজনৈতিক অধিকার না থাকলে ক্ষমতাবানদের দ্বারা প্রতি পদে পদে হত্যা, নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়। আমি এবং গোটা জুম্ম জাতিই এই বাস্তবতার শিকার। পরজীবী সম্প্রদায়ের (আইন আদালত সম্পৃক্ত উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, পুলিশ, কেরানী, পিওন, দারোয়ান সবাই) হাতে ৪০/৫০ হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে ১৬ মাস পর ৬ ডিসেম্বর ২০০৫ আমার অভিবাবক আমাকে জামিনে মুক্ত করতে সক্ষম হন। আমি বের হলাম বটে কিন্তু আমার চেয়ে আরো বেশি অসহায় নিরপরাধ লোকজন তো কারাগারের প্রকোষ্টে বন্দি রয়েছেন, যাদের উকিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের ৫টাকা ঘুষ (তাদের ভাষায় সম্মানী) দেয়ারও সামর্থ্য নেই তাদের অবস্থা কি হবে ? মূল কথা রাজনৈতিক অধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত শাসক শোষক গোষ্ঠির এই দমন-পীড়ন অব্যাহত থাকবে এটা নিশ্চিত। তাই সব ধরনের অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া আমাদের মত শোষিতদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই। ৮.০২. ২০০৬

খাগড়াছড়িতে সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে মিছিল

স্বাধিকার রিপোর্ট

খাগড়াছড়ির পেরাছড়ায় ১৯ জন নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রামে ৫ মে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। গত ৩ মে বিনা অপরাধে তাদের ওপর জনৈক মেজর শারীরিক নির্যাতন চালায়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অন্তরিকা চাকমা, যুব ফোরাম নেতা মিঠুশ চাকমা, কণিকা দেওয়ান প্রমুখ। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি রিংকু চাকমা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন, যাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে তারা কেউ কোন অপরাধ করেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও নেই। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ জনগণের ওপর সেনা নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানান ও পেরাছড়ায় নির্যাতিতদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানান।

সমাবেশের আগে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানেই সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়।

খাগড়াছড়িতে অব্যাহত সেনা নিপীড়ন ও ধরপাকড়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বৃহত্তর পাবত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ৫ মে '০৬ বিকেল ৪.৩০ টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে খাগড়াছড়িতে অব্যাহত সেনা নিপীড়নের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা ও দপ্তর সম্পাদক অংগ্য মার্মা। সভা পরিচালনা করেন ক্যহ্লাচিং মার্মা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণের নামে অব্যাহত সেনা নিপীড়ন চলছে। খাগড়াছড়িতে গত কয়েকদিন ধরে সেনাবাহিনী গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ নিরীহ জনগণকে নানাভাবে হয়রানি করছে। সেনা সন্ত্রাসের কারণে সাধারণ জনগণ বর্তমানে খুবই আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছে।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে মুক্তাঙ্গনে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিনিধি

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলন ও দাবিনামার প্রতি সংহতি জানিয়ে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গত ২৬ মে ২০০৬ বিকালে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। মিছিলটি মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে বায়তুল মোকাররম ঘুরে আবার মুক্তাঙ্গনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশের আযোজন করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপির সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা ও যুব ফোরাম ঢাকা শাখার অর্থ সম্পাদক আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা। সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিরন্তর এক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির অসহনীয় অবনতি, জোট সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে লুটপাট, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য, মিল কলকারখানার মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ, বেকারত্ব ইত্যাদি নানা সমস্যার কারণে জনজীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

মাইসছড়ি সেটলার হামলা সম্পর্কে ঢাকায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংবাদ সম্মেলন

স্বাধিকার রিপোর্ট

"আমরা বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন। ভিক্ষুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ভীষণভাবে শঙ্কিত। এদেশে সদ্ধর্ম পালন করতে পারবো কিনা তা নিয়ে আমরা রীতিমতো গভীরভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত।"

গত ২৭ এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের এই উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন। তারা অভিযোগ করেন, "প্রত্যেকটি ঘটনায় হয় বৌদ্ধ বিহার ও অনাথ আশ্রমে ভাঙচুর-লুটপাট বা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, নয় তো ভিক্ষুদের সাথে অশোভন আচরণ ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। বিহার ও আশ্রমে ভাঙচুর-লুটপাট ও পুড়িয়ে দেয়ার মধ্যেই ঘটনা থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে পরিকল্পিতভাবে বিহার ও আশ্রমের জায়গা বেদখল করা হয়েছে।"

পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ আয়োজিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংঘের সভাপতি সুমনালংকার মহাথেরো। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ৩ এপ্রিল মাইসছড়িতে সেটলার হামলার শিকার সুমনা মহাথেরো, সংঘের সহসভাপতি সুরিয়া মহাথেরো, সাধারণ সম্পাদক সত্যানন্দ মহাথেরো ও সদস্য প্রজ্ঞাজ্যোতি থেরো। উক্ত সংবাদ সম্মেলনের সমর্থনে উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ২৪ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ঢাকায় আসেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের উপর পরিচালিত বিভিন্ন হামলার বর্ণনা দেন ও সরকারের কাছে চার দফা দাবি তুলে ধরেন। এগুলো হলো ১. অবিলম্বে মাইসছড়ি বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ শিশুঘরের বেদখলকৃত জায়গা দখলমুক্ত করে ফেরত দেয়াসহ আশ্রমটি চালু করা হোক। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য বিহার ও আশ্রমের বেদখলকৃত জায়গাও দখলমুক্ত করার ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হোক। ২. মাইসছড়ি ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ, ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা এবং ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা তুলে নিয়ে ঘরবাড়ি-এলাকাছাড়া লোকদের স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ৩. রাস্তাঘাটে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চলাফেরায় যাতে সেনা বা কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক তলাশীর নামে হেনস্থা করা না হয়, সে ব্যবস্থা করা হোক। ৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভবিষ্যতে যাতে আর কোন ধরনের প্রাণহানি, ভূমি বেদখল বা হামলার ঘটনা না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হোক।

মাইসছড়ি ঘটনা সম্পর্কে ভিক্ষুরা বলেন, গত ৩ এপ্রিল মাইসছড়িতে যে ঘটনা ঘটে গেল, তার মূলে রয়েছে জমি বেদখল প্রচেষ্টা। সেখানে সাউপ্রু পাড়া ও জয়সেন কার্বারী পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ শিশুঘরের (অনাথ আশ্রম) মালিকানায় ৮ একর জমি রয়েছে। যার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হলেন সুমনা মহাথেরো। এ বিহারের ৭ একর জায়গা বহিরাগত সেটলাররা অনেক আগেই বেদখল করে ফেলেছে। বাকি এক একর জায়গায় বিহার ও আশ্রমটি সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, বর্তমানে তাও আগ্রাসীদের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়েছে। বিহার ও আশ্রমটিই এখন টার্গেট। তা উচ্ছেদ করা গেলে পুরো দখল কায়েম হবে। সে কারণে দীর্ঘদিন ধরে ঐ বিহার ও আশ্রমের জায়গা দখলের লক্ষ্যে বহিরাগত সেটলাররা নানান ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছিল। ৩ এপ্রিল সেই ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেদিন সেটলারদের হামলায় বিহারের ভিক্ষু সুমনা মহাথেরো শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন প্রত্যাহারের দাবিতে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের বিক্ষোভ

ঢাকা প্রতিনিধি

পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাশাসন প্রত্যাহারের দাবিতে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উদ্যোগে গত ২৫ মার্চ'০৬ বিকেল ৪.৩০ টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের আহ্বানে সমাবেশের অংশ হিসেবে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সদস্য সচিব ফরহাদ হোসেন। এতে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সভাপতি বদরুদ্দীন উমর, সাধারণ সম্পাদক ফয়জল হাকিম লালা, মুক্তি কাউন্সিল নেতা ভূলন ভৌমিক, নিপু চাকমা ও অংগ্য মার্মা।

বক্তারা বলেন, অপারেশন উত্তরণের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নির্যাতন ও লুণ্ঠন জারী রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের বাঙালী হওয়ার কথা বলে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়েছিলেন। প্রতিটি সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছে। সংঘটিত করেছে একের পর এক গণহত্যা। নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে পাহাড়িদের। বর্তমানে এই নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন,পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ও শাসকগোষ্ঠির নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাহাড়ে এবং সমতলে আন্দোলন জোরদার করতে হবে। জাতিগত ও ভাষাগত জাতিসত্তাসমূহের উপর শাসকশ্রেণীর এ ধরনের নিপীড়ন- নির্যাতনের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে এই লড়াই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন বন্ধ করে সেখানকার জনগণের ন্যায্য অধিকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল মুক্তাঙ্গন থেকে বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

লক্ষীছড়িতে পিসিপির ৫ নেতা কর্মি গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত

গত ২০ মে '০৬ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৭তম কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শেষে খাগড়াছড়ি থেকে লক্ষীছড়িতে ফেরার পরই পরই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ জন নেতা কর্মিকে সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে ২১ মে '০৬ বিকাল ৪:৩০ টায় ঢাকার মক্তাঙ্গনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা শাখার সহ-সভাপতি অনুতোষ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি ঢাকা শাখার সাংগঠকি সম্পাদক সুমেন চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমা। সভা পরিচালনা করেন অংগ্য মারমা।

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে অকথ্য নির্যাতনের পর মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

গত ২১ মার্চ লক্ষীছড়ি সেনারা নিসাইপ্রু মারমা ও মেজাঙ্যা চাকমা নামে দুই নিরীহ চাষাকে আটক করে। গত ৪ ডিসেম্বর'০৫ সেনারা গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা সুপার জ্যোতি চাকমাকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে থানা হাজতে প্রেরণ করে। গত ৬মার্চ খাগড়াছড়িতে ৬ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অকথ্য নির্যাতনের পর অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে থানা হাজতে প্রেরণ করে। এর পরও ক্ষান্ত না হয়ে পুলিশ কাস্টডি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেনারা তাদেরকে আরেক দফা হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে। এভাবে সেনারা আইন-আদালত অবমাননা করে জুম্ম জনগণের উপর নির্দয় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পিসিপি'র নেতাকর্মিদের উপর ধর-পাকড় জারি রেখে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে প্রেরণের মাধ্যমে নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহত রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাঁধা সৃষ্টি করছে।

নেতৃবৃন্দরা আরো বলেন, বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলে যখন সীমিতভাবে হলেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে তখন পার্বত্য অঞ্চলে চলছে সেনা খবরদারী-নজরদারী-নিপীড়ন ও হয়রানী। সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' এর মাধ্যমে সেখানে বিভিন্ন জাতিসত্তার জুম্ম জনগণের উপর চালানো হচ্ছে সেনা নিপীড়ন। সেনাবাহিনী রাতে বিরাতে গ্রাম থেকে ঘুমন্ত লোকজনকে ধরে এনে অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। এরপর সেনারা নিজেদের জোগাড় করা অস্ত্র এসব লোকজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছবি তুলে মিথ্যা অস্ত্র মামলায় জেলে প্রেরণ করছে। মাঝে মাঝে সেনাবাহিনী নিজেদের অস্ত্র থেকে বেপরোয়া গুলি ছুঁড়ে, তারপর কৃথিত 'সন্ত্রাসীদের' সাথে গুলি বিনিময়ের মিথ্যা ঘটনা সাজাচ্ছে। পত্রিকাগুলোও সেনাদের দেয়া তথ্য যাচাই না করে ছাপাচ্ছে। এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার।

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারকৃত নেতা কর্মিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম থেকে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে জারী করা সেনা শাসন তুলে নেয়ার দাবি জানান।

পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির কাউন্সিল ও সম্মেলন সম্পন্ন

"উপজাতি-আদিবাসি নয়, জাতিসত্তার পরিচয়ে বিকশিত হতে চাই" এই শোগানকে সামনে রেখে গত ২১ মে '০৬ দিনব্যাপী স্বনির্ভর এলাকায় মানবেন্দ্র চাকমার সভাপতিত্বে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের ১ম অধিবেশনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জেলা সভাপতি রীনা দেওয়ান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রনি চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে সরকার গভীর ষড়যন্ত্র করছে। উপজাতি-আদিবাসি ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়ে জাতিসত্তাসমূহকে পদানত ও অধস্তনে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষণ ও নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য নেতৃবৃন্দ ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনি বিকাশ চাকমা। রিপোর্ট পেশ করার পর কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে এক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনি বিকাশ চাকমাকে সভাপতি, অর্পণ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রোমান চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা।

লক্ষীছড়িতে সুশীল চাকমাকে আটকের প্রতিবাদে পিসিপির বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের লক্ষীছড়ি থানা কমিটির সভাপতি সুশীল চাকমাকে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক ও মিথ্যা মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করার প্রতিবাদে ২৮ মার্চ'০৬ বিকেল ৪.৩০টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি রূপন চাকমা। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা, শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ক্যহ্লাচিং মার্মা। সভা পরিচালনা করেন ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মার্মা।

বক্তারা দেশের সকল প্রগতিশীল শক্তিকে এই স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান এবং অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সুশীল চাকমাকে মুক্তির দাবি জানান।

বিজিতলা থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটককৃতদের স্ত্রীরা

শেষ পাতার পর

বিপব চাকমা (১২) পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে আর মেয়ে রূপালী চাকমা (৩) এখনো পড়ছে না।

আটককৃত বাঁশি চাকমার স্ত্রী অঞ্জনা চাকমা (৩০) জানান, তার স্বামী একজন দিনমজুর। সারাদিন দিন মজুরী করে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর নিয়ে পরের দিন আরো কোথায় কাজ পাওয়া যায় এই চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সে। রাত আনুমানিক ১২টায় একই কায়দায় সেনারা তার স্বামীকে ক্যাম্পে স্যার ডাকছে বলে ডেকে নিয়ে যায়। ঘন্টা দুই পরেও তার স্বামী বাড়িতে ফিরে না আসলে তার সন্দেহ হয়। তারপরও তার স্বামী ফিরে আসবে এই আশায় সারারাত না ঘুমিয়ে সে তার স্বামীর অপেক্ষায় বসে থাকে। কারণ সে জানে তার স্বামীর কোন দোষ নেই। কিন্তু পরদিন খবর নিয়ে জানতে পারে সেনারা তার স্বামীকে সন্ত্রাসী মামলা দিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। এই খবর শুনে তিনি যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকেন। কারণ সংসারে উপার্জনক্ষম একমাত্র সে। একদিন অন্যের বাড়িতে বেগার না খাটলে তাদের খাবার জোটে না। এখন তার স্বামীকে জেলে দেয়ার পর কি হবে সেটা ভাবতে ভাবতে তিনি কোন কুল কিনারা পান না। তার হচ্ছে দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে রিপেল চাকমা (১০) পড়ে ২য় শ্রেণীতে, মেজো ছেলে তাতুমণি চাকমা (৭) পড়ে ১ম শ্রেণীতে এবং মেয়েটির নাম যোশি চাকমা (৫) এখনও পড়েনা।

সুশীল কান্তি চাকমা (বনমালী) চাকমার স্ত্রী কল্পনা চাকমা (৪২) জানান, তার স্বামী পাজেরিকো নামক একটি এনজিও'র ঔষধি বাগানে দারোয়ানের চাকরি করেন। সেদিন অর্থাৎ ৪ মার্চ'০৬ রাত আনুমানিক এগারটা কি সাড়ে এগারটার দিকে বিজিতলা ক্যাম্পের সেনারা তার স্বামীকে খোঁজ করতে থাকে। সারাদিন ডিউটি শেষে তখন তার স্বামী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এত রাতে তাকে খোঁজ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সেনারা রেডি মেড উত্তর "স্যার ক্যাম্পে ডাকছে" বলে জানায়। তখন উপায়ান্তর না দেখে তার স্বামী সেনাদের সাথে ক্যাম্পে যায়। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তার স্বামী ফিরে না এলে খারাপ কিছু ঘটেছে বলে তার মনে সন্দেহ হয়। সেও সারারাত আর ঘুমায়নি। পরদিন খবর নিয়ে জানতে পারে তার স্বামীকে এক নম্বর আসামি করে সেনারা হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে খাগড়াছড়ি জেলে পাঠিয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকার ফলে তিনি চার ছেলেকে নিয়ে খুব কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন বলে জানান। তার বড় ছেলে নান্টু চাকমা (২০) শারিরীক প্রতিবন্ধী , মেজো ছেলেটির নাম রিন্টু চাকমা (১৬) পড়ছে নবম শ্রেণীতে, বাবলু চাকমা (২৪) পড়ছে রাঙ্গামাটি শিশুসদনে নবম শ্রেণীতে, আর সোনামুনি চাকমা (১২) পড়ছে পঞ্চম শ্রেণীতে।

প্রীতি জীবন চাকমার স্ত্রী সোনা চাকমা (২৫) জানান, তার স্বামী দিনমজুরী করেন। তখন রাত আনুমানিক ১২.৩০ টা। তিনি বলেন, "হঠাৎ সেনাবাহিনী আসার শব্দ শুনে আমরা জেগে যাই। এত রাতে কেন আর্মি আসলো তা আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বাড়ির উঠোনে এসেই সেনারা আমার স্বামীকে খুঁজতে থাকে।" তিনি জানান, তার স্বামী বাইরে গেলে সেনারা বলে, "স্যার ক্যাম্পে ডাকছে তাই আমাদের সাথে যেতে হবে"। এই বলে সেনারা তার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। ছোট্ট মেয়ে রেখাকে নিয়ে বর্তমানে সে খুব কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। স্বামী কবে মুক্তি পাবে এই আশায় তার এখন দিন কাটে।

কালা মার্মার স্ত্রী আথুবাই মার্মা (৪০) জানান, তার স্বামী একজন রিক্সা চালক ও দিনমজুর। সারাদিন রিক্সা চালিয়ে এবং দিন মজুরি করে যা আয় হয় তা দিয়েই তাদের সংসার চলে। সেদিন রাত আনুমানিক ১১.০০ টার সময় বিজিতলা ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য তার স্বামীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাকেও অন্যদের মতো মিথ্যা মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেলে রাখা হয়েছে। তার স্বামীর কোন দোষ নেই বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, "কেন তাকে সন্ত্রাসী সাজানো হলো তা বুঝতে পারি না। এটা খুব অন্যায়"। বর্তমানে তিনি তার তিন ছেলে-মেয়েকে খাওয়া-পড়া নিয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছেন বলে এই প্রতিবেদককে জানান। তার বড় ছেলে উচিমং মার্মা (১৩) পড়ে চতুর্থ শ্রেণীতে, মেজো ছেলে সচিমং মার্মা (৭) পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ছোট্ট মেয়ে রূপালী মার্মা (৫) এখনো পড়ে না।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (১৬ জুন) উক্ত ছয় নিরীহ ব্যক্তিকে এখনো ছেড়ে দেয়া হয়নি। তাদের স্ত্রীরা তাদের নির্দোষ স্বামীদের মুক্তি দাবি করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইদানিং নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিনিয়ত সাধারণ জনগণের উপর চলছে নিপীড়ন-নির্যাতন। সাধারণ লোকজনের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি উঠিয়ে সন্ত্রাসী সাজানো সেনাবাহিনীর একটা অপকৌশলে পরিণত হয়েছে। তড়িৎ প্রমোশন লাভের আশায় তারা এটা করে, নাকি সরকারী দমন নীতির অংশ হিসেবে করে, নাকি উভয় কারণে করে তা বলা মুশকিল। তবে এর অন্য একটি উদ্দেশ্য হলো পাহাড়িদের জায়গা জমি দখল করে সেখানে সেটলারদের পুনর্বাসন করা। দীর্ঘদিন থেকে গামারিঢালায় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটলার বাঙালীরা পাহাড়িদের জায়গায় ঘর-বাড়ি নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং বর্তমানে অনেক ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার লোকজন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির কতিপয় নেতা খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে কাউকে না জানিয়ে চুক্তি করে বসে। (যেভাবে তারা তথাকথিত শান্তিচুক্তিটা করেছে সরকারের সাথে।) চুক্তি মোতাবেক কেবল মাত্র সেটলার স্থাপনাগুলো তুলে নেয়া হবে এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। ফলে যাই হবার তাই হয়েছে। সড়ক অবরোধ তুলে নেয়া হলেও আর্মিরা তাদের কথা রাখেনি। তারা বেআইনীভাবে তোলা সেটলারদের বাড়িগুলো তুলে দেয়নি। জনগণের এই আন্দোলনকে রুদ্ধ করে দেয়ার জন্যই মূলত বিজিতলা থেকে এই ছয়জন নিরীহ গ্রামবাসীকে সন্ত্রাসী সাজিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে।

এই অবস্থা আর কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। সেনাবাহিনীর এই দমন নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ জনতার কাছে সকল অপশক্তি পরাজিত হতে বাধ্য। কানসাটের জনগণের মহান বিদ্রোহ সারা দেশবাসীকে এই শিক্ষাই নতুনভাবে শিখিয়েছে। জনতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র উদ্ধারের নাটক এবং সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন

৭ম পাতার পর

আশায় অস্ত্র উদ্ধারের নাটক মঞ্চস্থ করে, জঙ্গলের ভিতরে গ্রামে গিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ফুটিয়ে সন্ত্রাসীদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে প্রচার করে। এ ধরনের সাজানো ঘটনার ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। অনেকের ধারণা কিছু সেনা সদস্য জামাত-শিবির তথা ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠির কাছে গোলাবারুদ বিক্রি করে থাকে। এই ধারণার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। যেমন জামাত শিবির সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে প্রায়ই বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির গুলি উদ্ধার করা হয়। গত ২১ জুলাই'০৫ দৈনিক সংবাদের লিড নিউজের শিরোনাম হলো 'রাষ্ট্রীয় সমরাস্ত্র কারখানা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির গোলাবারুদ জামাত-শিবির ক্যাডারদের হাতে।' ওই সংবাদে বলা হয়, "২০ জুলাই বুধবার র‍্যাব চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থেকে জামাত শিবিরের শীর্ষ সন্ত্রাসী বড় নাছিরের অনুগত শিপন-বাবুল বাহিনীর কাছ থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল ও ১৭ টি অর্ডিন্যান্স ফ্যক্টরির গুলিসহ ৩৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। এর আগে ১০ জুন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ হাটহাজারীতে অভিযান চালিয়ে একটি একে-৪৭ ও ৬ রাউন্ড অর্ডিন্যান্স ফ্যক্টরির গুলিসহ শিবির ক্যাডার দুলাল উদ্দিন মুন্নাকে গ্রেফতার করেছিল।" এ পরিপ্রেক্ষিতে মীর আরজু রহমান এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "সরকারের প্রভাবশালী কেউ অর্ডিন্যান্স ফ্যক্টরির গোলাবারুদ বিশেষ মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠির হাতে পৌছে দেয়ার চক্রের সঙ্গে জড়িত অথবা এই গুলি পাচারকারী চক্রটি এতই শক্তিশালী যে সরকারেরও ক্ষমতা নেই চক্রটির গায়ে হাত দেয়ার অথবা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির গোলাবারুদের হেফাজতকারী সরকারি বাহিনীতে ওই চক্রের কালো হাত সংশিষ্ট থাকায় সেখান থেকেই মৌলবাদী ক্যাডাররা রাষ্ট্রীয় সমরাস্ত্র কারখানায় উৎপাদিত গোলাবারুদের চালান পাচ্ছে।"

প্রবন্ধের আর এক অংশে তিনি লিখেছেন,"এছাড়াও হতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান 'ইনসার্জেন্সির' কারণে সেখানে অবস্থানকারী সেনাবাহিনী ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ফোর্সদের জবাবদিহিতার উর্ধ্বে গোলাবারুদের অবাধ ব্যবহার ক্ষমতার সুযোগে কিছু অসাধু ফোর্সের সঙ্গে সখ্য তৈরি করে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা তাদের মাধ্যমে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে।' তিনি আরো লেখেন," দেশে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ' ইনসার্জেন্সি' বিদ্যমান থাকায় তথায় ব্যবহৃত গুলির খোসা জমা নেয়ার নিয়মটি অনুসৃত হয় না। যতদুর জানা যায়, এখানে সেনা সদস্যরা কে কত রাউন্ড গুলি ব্যয় করল সে বিষয়ে সংশিষ্ট পার্টির কমান্ডার মৌখিকভাবেই হিসাব নিয়ে থাকেন। যদিও পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর গুলির ব্যবহার যথাসম্ভব না করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।" (রাষ্ট্রীয় সমরাস্ত্র কারখানার গোলাবারুদ কারা তুলে দিচ্ছে মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠির হাতে, দৈনিক সংবাদ ৪ আগস্ট ২০০৫)। মীর আরজু রহমানের সংশয় অমূলক নয়। শুধু গোলাবারুদের হিসাব কেন, সেনাবাহিনী কোন প্রকল্পে কত টাকা খরচ করেছে তারও হিসাব নেয়া হয় বলে শোনা যায়নি। মূলকথা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে অবশ্যই একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া উচিত নয়। তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "অস্ত্র উদ্ধার" ও "সন্ত্রাসীর সাথে গুলি বিনিময়" সম্পর্কিত সেনা কমান্ডারদের সরবরাহ করা তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই ছাড়া প্রচার ও প্রকাশ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে।

খাগড়াছড়ির মাইসছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

খাগড়াছড়ির মাইসছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে বহিরাগত বাঙালীদের হামলার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ৪ এপ্রিল'০৬ বিকেল ৪.৩০ টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। "খাগড়াছড়িতে সেনা মদদে পাহাড়ি গ্রামে হামলা রুখো" শোগান সম্বলিত ব্যানারে ঢাকাস্থ পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরীজীবীরা এই মিছিলে অংশ নেয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি রূপন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা, পিসিপি ঢাকা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমেন চাকমা, ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ঢাকা শাখার সদস্য আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা। উপস্থাপনা করেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ক্যহ্লাচিং মারমা।

বক্তারা পাহাড়িদের উপর এই হামলাকে ন্যাক্কারজনক ও কাপুরুষোচিত আখ্যা দিয়ে বলেন, মানবতাকে হামলা করেছে পশুত্ব। নিরীহ পাহাড়ি গ্রামবাসীদের উপর এই হামলাকে বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বক্তারা বলেন, ভবিষ্যতে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাল্টা কিছু হলে সরকারকে এর দায়িত্ব নিতে হবে।

সমাবেশে বক্তারা আরো বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সেনা মদদপুষ্ট একটি সাম্প্রদায়িক চক্র পাহাড়ি-বাঙালীর দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। সেই চক্রকে ধ্বংস করতে হবে। বক্তারা অবিলম্বে হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের যথাযথ ক্ষতিপূরণসহ আহতদের চিকিৎসা এবং হামলাকারী বহিরাগত সেটলারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল মুক্তাঙ্গন থেকে বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

বিজিতলা থেকে ছয়জন গ্রামবাসীকে আটকের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি সদরের গামারীঢালা-বিজিতলা এলাকা থেকে ৪ মার্চ'০৬ দিবাগত রাত ২.০০ টায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬জন সাধারণ গ্রামবাসীকে আটক ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল হাজতে প্রেরণের প্রতিবাদে ৫মার্চ বিকেলে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট খাগড়াছড়ি সদরে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। উক্ত বিক্ষোভ মিছিলটি স্বনির্ভর বাজার থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার স্বনির্ভর বাজারে এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমা ও ইউপিডিএফ-এর জেলা ইউনিটের নেতা নতুন কুমার চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বিজিতলা ক্যাম্পের সেনা কমান্ডার মেজর মো: বশিরের নেতৃত্বে ৪মার্চ রাত ২টায় গামারীঢালা-বিজিতলা এলাকা থেকে ছয়জন সাধারণ গ্রামবাসীকে আটকের অভিযোগ করে বলেন, সেনাবাহিনী রাত-বিরাতে সাধারণ গ্রামবাসীকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে যা একই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যদিকে তা সরকারের উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। বক্তারা সেনাবাহিনীর এ ধরনের কাজকে ন্যাক্কারজনক, কাপুরুষোচিত এবং সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার পরিপন্থি বলে অভিহিত করেন এবং দোষী সেনা কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদান, অবিলম্বে সেনাশাসনসহ অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে যে ছয়জন গ্রামবাসীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবি জানান।

চট্টগ্রাম

খাগড়াছড়ি বিজিতলায় সেনাবাহিনী কর্তৃক সাধারণ জনগণের উপর নির্যাতন ও ছয়জন গ্রামবাসীকে আটকের প্রতিবাদে ৭মার্চ'০৬ বিকেল ৫.০০ টায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে। দোস্ত বিল্ডিং চত্বর হতে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহীদ মিনারে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মিঠুশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি স্বর্ণজ্যোতি চাকমা, ইউপিডিএফ-এর চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংগঠক অনিমেষ চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন রিপন চাকমা।

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহারের মাধ্যমে সেনাশাসনের অবসান ঘটনানোর আহ্বান জানান। সেনাবাহিনীর একটি স্বার্থন্বেষী মহলের এ ধরনের অপকর্ম বন্ধের লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও আহ্বান জানান এবং আটককৃত ছয়জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অবিলম্বে মুক্তির দাবি করেন।

কাউখালিতে ইউপিডিএফ সদস্যসহ ৬ ব্যক্তি আটক

স্বাধিকার রিপোর্ট

১৫ মে মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটির কাউখালির গাড়িছড়া থেকে ইউপিডিএফ-এর তিন সদস্য ও তিন গ্রামবাসীকে সেনা সদস্যরা আটক করেছে।

সেনারা রাত ১০টার দিকে গ্রামটি ঘেরাও করে তাদের গ্রেফতার করে। আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্যরা হলেন ভরণ চাকমা, সুমন্ত চাকমা ও নোবেল চাকমা। বাকি তিন জনের নাম জানা যায় নি।

আটককৃতদের রাঙ্গামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিজিতলা থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটককৃতদের স্ত্রীরা যা বললেন

স্বাধিকার প্রতিবেদক

গত ৪মার্চ'০৬ খাগড়াছড়ির বিজিতলা থেকে বাজার চৌধুরী কমলারঞ্জন চাকমাসহ ছয়জন নিরীহ গ্রামবাসীকে সেনা সদস্যরা রাতের অন্ধকারে নিজ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। এর পরদিন তাদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তোলার পর মিথ্যা মামলা রুজু করে তাদেরকে জেলে পাঠানো হয়। বিজিতলা আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর বশির গভীর রাতের এই আটক অভিযান চালায়। এর উদ্দেশ্য হলো গামারীঢালায় সেটলার কর্তৃক জমি বেদখলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণপ্রতিরোধকে দমনপীড়ন চালিয়ে ও জেল জুলুম দিয়ে নির্মূল করা।

গত ১৩ মার্চ'০৬ তাদের মধ্যে পাঁচজনের স্ত্রীদের সাথে স্বাধিকার প্রতিবেদকের কথা হয়। রাতের অন্ধকারে সেনাবাহিনী কিভাবে তাদের স্বামীদের ডেকে নিয়ে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে জেলে পাঠিয়েছে এই প্রতিবেদকের কাছে তারা সে বর্ণনা দেন এবং বর্তমানে তাদের চরম আর্থিক দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।

কমলা রঞ্জন চাকমার স্ত্রী সোনা চাকমা (৪০) জানান, রাত আনুমানিক ২ টায় বাইরে শব্দ শুনে সে জেগে যায়। কি শব্দ সে জানে না। কিছুক্ষণ পর শুনতে পায় সেনারা তার স্বামীকে ডাকছে। তখন তার স্বামী কমলারঞ্জন চাকমা ঘরের বাইরে গেলে তিনিও সেনাদের সাথে কথা বলতে যান।

এত রাতে কেন খোঁজ করা হচ্ছে সেনাদের প্রশ্ন করা হলে তারা "স্যার ডাকছে" বলে জবাব দেন, এবং বলেন, "স্যার কথা বলবে তাই একটু আমাদের সাথে যেতে হবে।" এত রাতে ক্যাম্পে তলব করার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন মতলব রয়েছে সোনা চাকমার মনে এমন ধারণা হলো। কিন্তু সেনাদের বাধা দেয় সাধ্য কার?। সেনারা সেই যে তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেলো কথা বলার নাম করে, আর ফিরিয়ে দেয়া হয়নি, সোজা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

পরদিন খবর পেয়ে সোনা চাকমা একেবারেই হতভম্ব হয়ে যায়। কারণ কমলা রঞ্জন চাকমার বাড়ি হচ্ছে বিজিতলা ক্যাম্পের একেবারে পাশে এবং তার সম্পর্কে ক্যাম্পে কোন খারাপ ধারণা আছে বলেও কারোর জানা নেই। তা ছাড়া তার দোকান থেকেই সেনারা প্রতিদিন বাজার করে থাকে। তার একটি মাত্র দোষ হলো গামারিঢালায় পাহাড়িদের জায়গা জমি বেদখলের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মতো তিনিও প্রতিবাদ করেছিলেন।

বর্তমানে খুবই আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছে বলে সোনা চাকমা স্বাধিকার প্রতিবেদককে জানায়। যে দোকানটা ছিল সে দোকানটিও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। ফলে ছেলেদের পড়াশুনার খরচ চালানোও খুবই সমস্যা হচ্ছে। তার দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে প্রদীপ চাকমা (১৬) পড়ে নবম শ্রেণীতে, মেজো ছেলে

১১ পাতায় দেখুন

নেপালে গণবিপ্লবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন

নেপালে রাজতন্ত্র বিরোধী বিক্ষোভ

জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামলে বিজয় যে অনিবার্য তার সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হলো বাংলাদেশের কানসাট ও হিমালয় রাজ্য নেপাল। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটবাসীরা বিদ্যুতের দাবিতে যে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন তা সফল পরিণতি লাভ করে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েও গণবিস্ফোরণ থামাতে পারেনি। ২০ জন গ্রামবাসীর রক্তের বিনিময়ে জনগণ তাদের দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করেন।

অপরদিকে, নেপালে জনগণের রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন ক্রমে গণবিপবে রূপ নেয়। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। রাজা জ্ঞানেন্দ্র সংবিধান সভা পুনর্বহাল করতে বাধ্য হন। বিরোধী দলগুলোর ওপর নির্যাতন, গ্রেফতার, গৃহবন্দী, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে খুন কোনকিছুই জনগণের বিপবী জোয়ার থামাতে পারেনি।

নেপালের এই এপ্রিল বিপবের পটভূমি হলো এ রকম: ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারী রাজা জ্ঞানেন্দ্র জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংবিধান সভা রদ করে সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার অভিযোগ নেপালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মাওবাদী বিদ্রোহীদের দমনে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বিদ্রোহীদের দমনের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু জনগণ রাজার ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণকে কোনভাবে মেনে নেয়নি। নেপালী কংগ্রেস ও নেপালী কমিউনিষ্ট পার্টিসহ ৭টি দল জোট গঠন করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এক পর্যায়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে এই সাত দলীয় জোটের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টি অব নেপাল (মাওবাদী) বা সংক্ষেপে মাওবাদীদের সাথে ১২ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপরই পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ভারত সরকার এই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন বলে সম্প্রতি মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দাহাল ওরফে কমরেড প্রচণ্ড স্বীকার করেছেন। অবশ্য মাওবাদীরা বহু আগে থেকেই ৭ দলীয় জোটের সাথে ঐক্যের ব্যাপারে তৎপর ছিল।

৭ দলীয় জোট ও মাওবাদীদের রাজতন্ত্র বিরোধী যৌথ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় এপ্রিল মাসে। হাজার হাজার লোক রাজধানী কাঠমন্ডুতে বিক্ষোভে অংশ নেন। গণআন্দোলন জোরদার করতে মাওবাদীরা রাজধানীর আশে পাশে এলাকায় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালালে ২০ ব্যক্তি প্রাণ হারান। কিন্তু এ যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার মতো। গণবিক্ষোভ দ্রুত গণবিপবে রূপ নেয় এবং রাজা ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি ১৪ মাস ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাজা জ্ঞানেন্দ্র সংসদ পুনর্বহালের ঘোষণা দেয়ার পর মাওবাদীরা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। নেপালী কংগ্রেস সভাপতি গিরিজা প্রসাদ কৈরালার নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার এতে সম্মতি জানায়। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি শুরু হয়। কৈরালার সরকার মাওবাদীদের ওপর থেকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা তুলে নেয় এবং গ্রেফতারকৃত মাওবাদী সদস্যদের মুক্তি দেয়। তার সরকার ভারতকেও অনুরোধ জানায় যাতে সে দেশে আটক ২৫ জন সামনের সারির মাওবাদী নেতাকে মুক্তি দেয়া হয়।

মাওবাদী বিদ্রোহী

১৮ মে নেপালের সংসদ এক ঘোষণায় পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে নেপালের মর্যাদা রদ করে। রাজার পৃষ্ঠপোষক কতিপয় ধর্মীয় সংগঠনের ব্যক্তি এর বিরোধীতা করলেও আপামর জনগণ বিশেষ করে সংখ্যালঘু জাতিগুলো এ ঘোষণার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। এ সব নিপীড়িত জাতিগুলো মাওবাদীদের অন্যতম প্রধান শক্তি। রাজতন্ত্র কিংবা বিগত গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের কোন ভূমিকা ছিল না। তারা ছিল সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত। কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল মার্কিস্ট লেনিনিষ্ট এর সিনিয়র নেতা ও সংসদ সদস্য রঘু জি পান্থ বলেন, "ঘোষণাটি সংখ্যালঘুদেরকে এক ধরনের রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্বের অনুভূতি জাগিয়েছে।" তিনি আরো বলেন, ঘোষণাটি হিন্দু আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছে যা দেশে স্বৈরাচারী রাজাকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে আইনগত বৈধতা দিয়েছিল। নেপাল সরকারের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব স্টেটিসটিক্স এর হিসাব মতে, নেপালে ১০৩ টি বর্ণ ও জাতিসত্তা রয়েছে। ভাষা আছে ৯২টি ও ধর্ম ১০টি। নেপালে ৮০ শতাংশ হিন্দু, ১২ শতাংশ বৌদ্ধ।

রাজতন্ত্র পতনের পর ২ জুন মাওবাদীরা কাঠমুন্ডুতে বিশাল সমাবেশ করে। বিবিসি ও এএফপির মতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও জাতিসত্তার দুই লক্ষ নেপালী এতে অংশগ্রহণ করেন। কান্তে হাতুড়ি পতাকা বহন করে, ড্রাম বাজিয়ে ও শোগান দিয়ে তারা এই ঐতিহাসিক সমাবেশে অংশ নেন। ২৬ মে মাওবাদীদের সাথে কৈরালা সরকারের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ১৬ জুন মাওবাদীদের শীর্ষ নেতা চেয়ারম্যান প্রচণ্ড ও গিরিজা প্রসাদ কৈরালার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক বর্তমান সংসদ ভেঙে দেয়া হবে, মাওবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠিত হবে এবং অস্থায়ী সংবিধান রচনার পর আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অপরদিকে, মাওবাদীরা তাদের গঠন করা সমান্তরাল সরকার ভেঙে দেবে। নির্বাচনের সময় উভয় পক্ষের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জাতিসংঘের সাহায্য চাওয়া হবে।

নেপাল সরকার মাওবাদীদের ওপর থেকে "সন্ত্রাসবাদী" উপাধি তুলে নিলেও মার্কিন প্রশাসন সেটা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিচার্ড বোউচার নেপালে এক সরকারী সফরের সময় বলেছেন, মাওবাদীরা আগের মতোই ওয়াশিংটনের "সন্ত্রাস তালিকায়" থাকবে। মার্কিন প্রশাসন ইতিপূর্বে সাত দলীয় জোট ও মাওবাদীদের ১২ দফা চুক্তিরও সমালোচনা করেছিল।

নেপাল হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশ। ১৯৪৭ সালে যখন রাজা জ্ঞানেন্দ্রর জন্ম তখন এই দেশটি যেন একটি নিষিদ্ধ রাজ্য। বাইরে দুনিয়ার কাছে রুদ্ধ, সামন্তরাজা শাসিত। ১৯৫১ সালেই কেবল নেপাল বাইরের পৃথিবীর জন্য দুয়ার খুলে দেয়। ১৯৯০ সালের আগে রাজনৈতিক দল ছিল নিষিদ্ধ। সে বছরই ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে রাজা বীরেন্দ্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থার সরকার কায়েম করতে বাধ্য হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ নেপালী জনগণের ভাগ্যের নুন্যতম পরিবর্তন হয়নি।

১৯৯৬ সাল থেকে মাওবাদীরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। তার আগে তারা সংসদে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রাম চালায়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর নেপালের ব্যাপক গ্রাম এলাকা এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। বলতে গেলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা রাজধানীর বাইরে যায় না। এপ্রিল মাসে টানা কয়েক সপ্তাহব্যাপী গণবিক্ষোভের মুখে রাজার পতনের পর মাওবাদীরা আগের চাইতে এখন অনেক বেশী শক্তিশালী। অনেকের ধারণা, আগামী নির্বাচনে যদি মাওবাদীদের সাথে ৭ দলীয় জোটভুক্ত বামপন্থী দলগুলোর জোট হয় তাহলে তারা একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করবে। জনপ্রিয়তায় এখন মাওবাদীরাই সবার শীর্ষে। অন্যান্য দলগুলো শাসন ক্ষমতায় থাকার সময় দুর্নীতি ও বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় তাদের ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছে।

রাজতন্ত্রের পতন ও গণতান্ত্রিক বিপব নেপালী জনগণের প্রাথমিক বিজয়। কারোর দয়া দাক্ষিণ্যে তারা এ বিজয় অর্জন করেননি। নিজেদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই তাদেরকে এতদুর নিয়ে এসেছে। এখন নেপালে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান, যেখানে বিভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারও সংরক্ষিত থাকবে।

বাংলাদেশের কারাভ্যন্তরের বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলন

উত্তম চাকমা (বামে)

বাংলাদেশের কারা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, কারাভ্যন্তরের বিভিন্ন সমস্য ও বন্দী জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে ৩১ মার্চ ২০০৬ বিকেল ৩ টায় ইউপিডিএফ-এর সদ্য কারামুক্ত সদস্য মি. উত্তম চাকমা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির বর্ধিত হল রুমে এক সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উত্তম চাকমা লিখিত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের কারা প্রশাসন ব্যবস্থা এমনভাবে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে যে সেখানে অনিয়মই যেন নিয়ম। বলা যায় অপরাধ জগতের আর এক নাম হচ্ছে কারাগার। কয়েদী এবং হাজতিদের সাথে দেখা করা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে তা করতে হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দীদের উপর অমানবিক নির্যাতন চলে। কারাগারের ধারণ ক্ষমতার দুই/তিন গুণ বেশি লোক রাখা হয়। ফলে কারাগারের কর্মচারী, ওয়ার্ড মেট, পানি মেট, হাসপাতাল মেটসহ সকল ক্ষেত্রে অর্থের লেন দেন করতে হয়। কারা বিধি অনুযায়ী কারাগারের সকল কয়েদী ও হাজতিদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সরকারের কারা বিধান অনুযায়ী এক জন কয়েদীর জন্য খাদ্য বাজেট ৩৪ টাকা থাকলেও তা কাগজে কলমে রয়েছে মাত্র। চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রে একই নীতি দেখতে পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, ইউপিডিএফ একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তার পূর্ণস্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন সেনা বাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মন্তব্য করে তিনি বলেন, যারা অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাদেরকে সেনারা সন্ত্রাসী বানায় ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে হয়রানি করে থাকে। তার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং বলেন, তাকে কারাগারে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে এবং নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছে। কারাগারে জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণের চিত্র তুলে ধরে উত্তম চাকমা বলেন, কারাগারের ভেতরেও পাহাড়ি বাঙ্গালী ভেদাভেদ রয়েছে এবং পাহাড়ি কয়েদীদের স্ব স্ব ধর্মের প্রার্থনায় সুষ্ঠ পরিবেশ দেয়া হয় না।

২য় পাতায় দেখুন

পিসিপির ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। এ উপলক্ষে পিসিপির নান্যাচর, কাউখালি ও কুদুকছড়ি শাখার উদ্যোগে কুদুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের হলরুমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ধর্মজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন পিসিপির সহসভাপতি স্বর্ণজ্যোতি চাকমা, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ভবতোষ চাকমা ও ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলা প্রতিনিধি চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিসিপি ঢাকা শাখার দপ্তর সম্পাদক সুমেন চাকমা।

বক্তারা বলেন, ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে লংগদু গণহত্যার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করার অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ও

২য় পাতায় দেখুন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ইউপিডিএফ কার্যালয়, স্বনির্ভর বাজার, উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়ি)